কেদার-বদরী



জ্যোতিষচন্দ্র রায়

কেদার বদরী

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৫৮

দাম : ৪.৫০

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

ইংরেজী ১৯৫২ সালে আমরা কেদারবদরী যাই। ভ্রমণকাহিনী লেখার কোন কল্পনাই তখন মনের মধ্যে ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির রসিক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে বালির মাসিক পত্র 'সাধারণী'র জন্য 'কেদারবদরীর পথে' নাম দিয়ে এটি মাসে মাসে লেখা হয় ও 'সাধারণী'তে বার করা হয়। শিক্ষাবিদ্ পরম স্নেহাস্পদ শ্রীঅনাথনাথ বসু এই লেখা প্রকাশে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখন শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের চেষ্টায় সেই লেখা বই হয়ে বার হল। বই ছাপতে গিয়ে দেখছি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখার জন্য জায়গায় জায়গায় পুনরুক্তি দোষ হয়েছে। একই জায়গা বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন জায়গার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক বার নতুন করে এসে পড়েছে, আর টানা-পোড়েনের সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে গেছে যে এখন তাকে আলাদা করতে গেলে লেখার সহজ প্রবাহ ব্যাহত হবে। তাই সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম। 'সাধারণী' সম্পাদকের সৌজন্যে এবং প্রকাশ ও মুদ্রণের সকল কর্মীর দাক্ষিণ্যে বইখানি সময়মত বের হল। এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণাতীত উচ্চতা ও সীমাহীন বিস্তারের দুইটি প্রধান অবলম্বন হিমালয় ও সমুদ্র। তাই হিমালয় দেবতাত্মা আর নারায়ণ ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ী। তারই একটি অবলম্বন হিমালয়ের কথাই এখানে কিঞ্চিৎ বলার চেষ্টা করেছি। এই বই পড়ে যদি কেউ সেই হিমালয়ের ডাকে সাড়া দেন ও হিমালয়-ভ্রমণের আনন্দ পান তবেই এই লেখা সার্থক হবে।

দীপাবলী, ১৩৬৫

১ ডোভার লেন,
কলিকাতা-২৯

জ্যোতিষচন্দ্র রায়

সূচীপত্র

চলতি

ছেলেবেলা থেকেই কেদার-বদরী যাবার একটা ইচ্ছা ছিল। কেন ছিল এখন তা বলা কঠিন। অনেক দিনের কথা। আমার মনের কাছেও তা আর খুব স্পষ্ট নেই। নেহাতই একটা অহেতুক ইচ্ছা আর কি! ছেলেবেলায় মুখে মুখে তীর্থদর্শন আর ভ্রমণের গল্প শুনেছি। তার সঙ্গে পাহাড়ের বেশি কিছু যোগ ছিল না, বরং সাগরের কিছুটা ছিল। তবুও তারই মধ্যে কখন যেন কেদার-বদরীর নামটা শুনেছিলাম। আর শুনেছিলাম, কেদার-বদরী হিমালয়ে। কেদারবদরী আর তীর্থভ্রমণ এই দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে কখন যে মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট রূপ নিয়েছিল এখন তা আর ভাল করে ধরতে পারি না।

আমরা সব সমতলের লোক। খোলা মাঠ, সবুজ প্রান্তর, নদী নালা পুকুর নিয়ে আমাদের কারবার। উঁচু-নিচুর আমরা ধার ধারি না। তাই বোধ হয় খুব উঁচু আর খুব নিচু জায়গা আমাদের সহজেই আকর্ষণ করে। পাহাড় আর সাগর যেন আমাদের কাছে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়। দুই-এরই প্রচ্ছন্ন একটা আকর্ষণ আমাদের অন্তর-প্রকৃতিকে যেন দুর্নিবার বেগে টানতে থাকে। তার কারণটা সকল সময় আমরা বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু তাই বলে তার টানের বেগে কোন তারতম্য ঘটে না।

তবুও জল আর জল, পারাপারহীন দুস্তর বিশাল জলরাশির সঙ্গে সমতলে আমাদের পরিচয় আছে। সাগরের উচ্ছল দুরন্ত প্রাণপ্রবাহ ও অনন্ত বিস্তার তার মধ্যে নাই, তবুও সাগরেরই একটা

অস্ফুট আভাস ও ইঙ্গিত যেন তারা আমাদের কাছে বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু পাহাড়! সে তো আমাদের অজানা। সে তো কেবল স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে গড়া।

আর যে-সে পাহাড়ও তো নয়। হিমালয় পাহাড়। জানা-অজানা, শোনা না-শোনা, পড়া না-পড়া, বোঝা না-বোঝা দিয়ে রঞ্জিত আমাদের হিমালয়। তুষারমৌলি, হিমবান, নগাধিরাজ হিমালয়। তাই কি হিমালয়ের ডাক? কেবলই তাই? যুগ যুগ ধরে ভারতের নরনারীর অফুরন্ত ভক্তির যে-প্রবাহ ঘরসংসার, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিয়ে হিমালয়ের পথে পাগলের মত ছুটে চলে এসেছে তার কিছু রেশ কি আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে নেই? তার কোন অনুরণন কি আমাদের নাড়ীর স্পন্দনে স্পন্দনে অশ্রুত বিচিত্র কলরোলে বেজে উঠছে না? শুধুই কি হিমালয়, কেদার-বদরী নয়, পিতৃপিতামহের অখণ্ড ধারাবাহিকতা নয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন অতীত নয়, কেবলই বর্তমান? জানি না, তবে টান একটা বরাবরই ছিল। তাই জীবনসায়াহ্নে তার দাবি মেটাতে হল।

গত এপ্রিলে, ইংরেজি ১৯৫২ সালে, শ্রীরতনমণি চাটুয্যে, শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা ও আমি এই তিন বন্ধুতে মিলে সেবাপুরী সম্মেলনে গিয়েছিলাম। তার কিছু আগে থাকতেই কেদার-বদরী যাবার একটা ভাসা-ভাসা কথা চলছিল। আমাদের আগ্রহও ছিল, ভয়ও ছিল। কাজেই কথাটা তেমন দানা বাঁধতে পারে নাই। সর্বোদয় সম্মেলন শেষ হলে কাশী হয়ে দিল্লি বেড়াতে গেলাম, বন্ধু শ্রীঅনাথনাথ বসুর ওখানে। অনাথবাবুর আগ্রহ ও তাঁর স্ত্রী সুশীলাদেবীর উৎসাহে দ্বিধাগ্রস্তভাবে হিমালয় যাত্রার প্রস্তাবেই রাজি হতে হল। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে রাস্তা। কতটুকু চওড়া কে জানে? পা পিছলে টুক করে পড়ে গেলেই হল। বয়েসটাও হয়েছে—চড়াই-উতরাই করতে পারবো কি না কে

জানে! মত দিলাম বটে, উৎসাহও হল, কিন্তু মনের মধ্যে ভয়-ভয়ও করতে লাগল।

যাই হোক, উদযোগ-আয়োজন চলতে লাগল। অনাথবাবুই সব করতে লাগলেন। দিকে দিকে চিঠিপত্র লেখা, আমাদের জিনিসপত্র জোগাড় করা সব কাজই অনাথবাবুর। রতনদার কলকাতায় জরুরি কাজ ছিল। তাঁকে চলে আসতেই হল। দুই বন্ধুতে রয়ে গেলাম। জিনিসপত্র বিশেষ-কিছুই নিয়ে যাই নি। সেগুলি ওখানেই জোগাড় করতে হল। আর জিনিসপত্র এমন বেশি কিছুও নয়। এক এক জনের তিনখানি করে ধুতি, দুটো সুতি পাঞ্জাবি, দুটি ফতুয়া আর গামছা তো সঙ্গে ছিলই। তার উপর একটা পাতলা গরম পুল-ওভার, একটা পুরোহাতা সোয়েটার, একখানি গরম চাদর, দু জোড়া গরম মোজা ও এক জোড়া রবারের সোল-দেওয়া কাপড়ের জুতোর জোগাড় করতে হল। বিছানার মধ্যে দুটি গায়ে দেওয়ার ও একটি পাতবার কম্বল, চাদর ও মশারি। বয়স বেশি ও দুর্বল বলে দুজনের বিছানায় কম্বলের বদলে সরু একটা পাতলা তোশক ও একখানি করে লেপ নেওয়া হল।

কথা ছিল এপ্রিল মাসের শেষের দিকেই রওনা হওয়া যাবে। এর মধ্যে জানা গেল, শেষের দিকে বেশি বরফ পড়ায় বদরীনাথে অনেক ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ঠিক হল মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সকলে হরিদ্বারে একত্র হওয়া যাবে ও সেখান থেকে একসঙ্গে রওনা হতে হবে। দিল্লি থেকে এক দল যাবে, কলকাতা থেকে এক দল, আর এক জন যাবেন দেরাদুন থেকে।

৪ মে তারিখ রাত্রিতে দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসে দিল্লি থেকে রওনা হলাম আমরা পাঁচ জন। ধর্মপ্রাণ চৈনিক অধ্যাপক লিয়াং চাও চা, শ্রীসুশীলা বসু, সুশীলাদের বাড়ির শ্রীদুর্গা দাসী, সুধীরবাবু ও আমি। অনাথবাবু অনেক দিন আগেই কেদার-বদরী সেরে এসেছেন। তাই এবারে আর গেলেন না। তাঁকে পেলে আমাদের

খুব ভালই লাগত, সুবিধাও হত। তাঁর আগ্রহেই আমাদের যাওয়া। যাওয়ার ছক টক তিনিই করে দিলেন বটে, কিন্তু দেখা গেল সে-সবেতে তাঁর আসক্তির নামগন্ধও নাই। আগ্রহটা নিছক আমাদের জন্যই।

আমাদের জিনিসপত্রের ওজন বেশি ছিল না, কিন্তু মহামায়ারা তো সঙ্গে ছিলেন। তাই কিছু কিছু ঘি, তেল, চাল, ডাল, রকমারি আচার, চা দুধ, লণ্ঠন, স্টোভ, বালতি, বাসনপত্র, ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, সব নিয়ে টুকিটাকি জিনিস সংখ্যায় কিছু কম হল না। অথচ দেরাদুনের গাড়িতে বেজায় ভিড়, মাথা গলাবার জায়গা পর্যন্ত নাই। তবু তারই মধ্যে ঠেলেঠুলে কোন রকমে উঠতে হল। মেয়েদের মেয়ে-কামরায় তুলে দিয়ে আমরা দূরে একটা কামরায় গিয়ে ঢুকলাম। বেঞ্চে জায়গা হল না। মেজেতে বাঁধা-বিছানার উপরে বসে ঢুলে ঢুলেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া গেল।

হরিদ্বার

ভোরের আলো-আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বার স্টেশনে এসে পৌঁছলাম ৫ মে তারিখে। বন্ধু সুবোধ বাবু স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের সুবিধা হল। সুবোধবাবুর সঙ্গে একেবারে ভোলাগিরির ধরমশালায় গিয়ে উঠলাম। সুবোধবাবুরা কলকাতা থেকে আমাদের আগেই এসে পোঁছেচেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ যাদবপুরে থাকেন। তাঁর স্ত্রী রেণু ও বোন পারুলও সঙ্গে এসেছেন। দেরাদুনের জনপ্রিয় ডাক্তার সোমের পরিচয়ে ধরমশালায় আমরা ভাল জায়গাই পেলাম। গঙ্গার একেবারে উপরে তেতলায় দুটো ঘর ও একটা খোলা গাড়ি-বারান্দা—সম্পূর্ণ আলাদা। নিচেই ভরা গঙ্গা তর তর করে বয়ে চলেছে।

মেয়েরা গঙ্গায় নাইতে ও ঠাকুর দেখতে চলে গেলেন। তাঁরা ফিরে এসে রান্নার জোগাড়ে লেগে গেলে আমরাও চললাম হর-কি-পৈরির ঘাটে—সুবোধবাবু, সুধীরবাবু, অধ্যাপক চা-সাহেব ও আমি। চা-সাহেবের বিচিত্র বেশভূষা, ফরসা রঙ ও চীনে চেহারা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। চা-সাহেবের সঙ্গে একটা কাঠের ছোট হাতি, সুন্দর কারুকার্য-করা। তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে দিল্লিতে স্টেশনে আসবার আগে চা-সাহেবের এক বন্ধু হাতিটি তাঁকে উপহার দেন। চা সেটি সঙ্গে করে এনেছেন। আমরা সকলেই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলাম। চা নিজেও স্নান করলেন, হাতিটিকেও সযত্নে স্নান করালেন। স্নানান্তে ঘাট-পাণ্ডারা সবাইকে ফোঁটাতিলক পরিয়ে দিলে। হাতিটিকেও দেওয়া হল। বেশ সুন্দর কারুকাজ করা ছোট্ট হাতিটি। কাণ্ড দেখে রীতিমত লোক জমে গেল। একে তো সুদৃশ্য ছোট্ট হাতিটি। তার উপর এক চীনে সাহেব তাকে মমতার সঙ্গে সযত্নে স্নান করাচ্ছে, ফোঁটা-তিলক দেওয়াচ্ছে। হাতি চীনেদের ঠাকুর-দেবতা কি না, লোকেরা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

স্নান করে ফিরে দেখি, ডাক্তার সোম দেরাছুন থেকে গাড়ি করে তাঁর স্ত্রী প্রেমলতাকে নিয়ে এসেছেন। লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারা, কথায় একটু বিদেশী টানের আমেজ, ডাক্তারকে বাঙালী বলে মনেই হয় না। আলাপ করে দেখলাম অতি অমায়িক সজ্জন লোক। ছু তিন পুরুষ ধরে উত্তর প্রদেশে আছেন। ভাল ডাক্তার, লোকে খুব ভালও বাসে, প্রভাব-প্রতিপত্তিও খুব। প্রেমলতা সুশীলার ছোট বোন।

ছুপুরে খিচুড়ি সেবার পর ম্যাপ ট্যাপ দেখে প্ল্যান করা হল। কনখল থেকে সুধীরবাবুর বন্ধু হরিদাস কবিরাজ মশায় এলেন। শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী, গুরুকুল আয়ুর্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ, সুধীরবাবুর অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু। বদরী-নারায়ণের পাণ্ডা সীতারাম

ভট্টের ভাই এসে জুটলেন। ডাক্তার সোম তো ছিলেনই। সব খোঁজ খবর নিয়ে রাস্তাঘাটের কথা ঠিক করে দেওয়া হল।

বিকেলে কিছু কেনাকাটা ছিল, সুবোধবাবুদের কলেরা ইনজেকসনের পরচা (সার্টিফিকেট) নেওয়া ছিল, বেড়ানোরও একটু ইচ্ছা ছিল। সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম। ভোলাগিরির মঠে মানিকতলা বোমার মামলার হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল আছেন। এখন তাঁর নাম বিশুদ্ধানন্দ স্বামী। ১৯২০-২১ সালে হৃষীদা চেরি প্রেসে বিজলী আফিসে থাকতেন। দিলখোলা, স্নেহপরায়ণ, সদানন্দ পুরুষ। পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যান। বুড়ো হয়ে পড়েছেন। সব জিনিস মনে রাখতে পারেন না। ত্রিশ বত্রিশ বছর পরে দেখা, চিনতে একটু কষ্ট হল। তারপর একে একে অনেক কথা মনে পড়ে গেল। অনেক পুরোনো লোকের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

ওখান থেকে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম। হর-কি-পৈরির ঘাটের কাছে মস্ত বড় একটা চাতাল গঙ্গার মধ্যে চলে গিয়েছে। সেইটেই বেড়াবার জায়গা। কিন্তু এমন চমৎকার জায়গার এ কি দশা হয়েছে ! পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে একবার হরিদ্বার এসেছিলাম। তখন এই জায়গাটি নিরিবিলি শান্তির জায়গা ছিল। এখন সেই চাতালটার মাঝখান ফুঁড়ে এক গম্বুজ উঠেছে বিড়লার জয় ঘোষণা করে। চতুর্দিকে রেডিওর বেপরোয়া আওয়াজ, আর বিশ্রী গোলমাল। জায়গাটির না আছে সৌন্দর্য, না আছে সেখানে শান্তি। ধ্যান-ধারণা করা দূরে থাক, নিরিবিলিতে একটু যে বসা, তারও জো নাই। সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডে প্রদীপ-ভাসানো দেখে বাসায় ফিরে এলাম। ফেরার পথে মেয়েরা বাজার করলেন। আমরা আগায় লোহাবাঁধানো বাঁশের লাঠি কিনলাম, পাহাড়ে চড়বার সুবিধার জন্য। প্রত্যেকের জন্যই একটা করে লাঠি কেনা হল। নয়টা লাঠি আমাদের দরকার।

হৃষীকেশ

৬ তারিখে সকালেই আমরা বাস্‌-এ করে হৃষীকেশ রওনা হলাম। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ চৌদ্দ মাইল। হৃষীকেশ থেকেই আমাদের দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরম্ভ হবে। যাত্রী আমরা নয় জন। পাঁচজন মেয়ে আর চারজন পুরুষ। বিস্তর মোটঘাট। হৃষীকেশ পর্যন্ত প্রায় সমতলের রাস্তা—চড়াই-উতরাই নাই। যেতে ডানদিকে মীরাবেন-এর 'পশুলোক' ফেলে রেখে চললাম। পশুলোক দেখার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাস্‌-এর রাস্তা থেকে খানিকটা দূর। সময়ও ছিল না আমাদের হাতে।

হৃষীকেশে ভরতমন্দিরের ধরমশালায় ওঠা গেল। একটি মাত্র ঘর পেলাম। ঘর আর বারান্দা নিয়ে আমাদের থাকার জায়গা হল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা। মন্দিরটি সুন্দর। মন্দিরের লোকদের একটি মধ্যবিদ্যালয়ও আছে। দুপুরে গঙ্গাস্নান করে সেই স্টোভে-রান্না তরকারি-দেওয়া খিচুড়ি আনন্দ করে খাওয়া গেল। গঙ্গা এখান থেকেই সরু হতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু স্রোতের বেশ বেগ। বৈকালে কালি কমলিওয়ালার পঞ্চায়েত-ক্ষেত্রে গেলাম। কেদার-বদরীর রাস্তায় যাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক জায়গায় কালি-কমলিওয়ালার ধরমশালা ও গদি আছে। হৃষীকেশ তাদের হেড-আফিস। এখান থেকে পরচা অর্থাৎ পরিচয়পত্র নিয়ে গেলে ধরমশালায় জায়গা পাওয়ার কোন অসুবিধা হয় না। কখনও কখনও পাতবার জন্য সতরঞ্চিও মেলে। তা ছাড়া অনেকে এখানে টাকা জমা দিয়ে জমা-রসিদের পরচা নিয়ে যায়। রাস্তায় যে কোন গদিতে ঐ পরচা দেখিয়ে প্রয়োজনমত টাকা তুলে নিতে পারে।

বৈকালে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে লছমনঝোলায় স্বর্গদ্বারের

দিকে বেড়াতে গেলাম। স্বর্গদ্বারের দিকে কয়েকটি মন্দির ও আশ্রম আছে। পারাপারের জন্য একটি ঝোলা-পুলও আছে। ফিরে এসে বাজার করা গেল। বাজারটি বেশ বড়। সব রকম জিনিসই পাওয়া যায়। তরি-তরকারির অভাব নাই, দাম একটু চড়া। চাল খুব ভাল।

হৃষীকেশ থেকেই পাহাড়-চড়া আরম্ভ হবে। অবশ্য এখনও অনেক দূর বাস্-এ যেতে হবে। তাই এখানেই সব বাস্-কোম্পানির আফিস ও আড্ডা। অনেক কুলি-এজেন্সিরও আফিস এখানে। এজেন্সির মারফত এখান থেকেই অনেকে কুলি বন্দোবস্ত করে নেয়। তারা নিজেদের খরচায় রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত যাত্রীদের সঙ্গে বাস্-এই যায়। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তাই সেখান থেকেই কুলিদের কাজ আরম্ভ হয়। অনেক কুলি হাঁটাহাঁটি করল, কিন্তু আমরা ওখানে কুলিদের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করলাম না। বাস্ কোম্পানির আফিসে ৭ তারিখ সকালে বাস্ ধরার ব্যবস্থা করে আসা হল।

সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি দেখতে গেলাম। মন্দিরের ব্যবস্থা ভাল। কোন রকম গোলমাল নাই। বেশ শান্ত সুন্দর আবেষ্টন। আবহাওয়ায় একটা গুরুগম্ভীর ভাব। ভক্তি যেন এখানে আশ্রয় পায়!

পরের দিন আসল তীর্থযাত্রা শুরু হবে। কেমন না জানি পথ, রাস্তায় কি রকম কাটবে কে জানে? অজানার আকর্ষণ ও অনিশ্চিতের চিন্তার মধ্য দিয়ে রাতটা কেটে গেল। ৭ তারিখ ভোরে রাত থাকতে উঠে সাজ সাজ লেগে গেল।

লছমনঝোলা

৭ই মে ভোর ভোর সকলে তৈরি হয়ে হৃষীকেশের ধরমশালাকে নমস্কার করে বেরিয়ে পড়লাম। মোটঘাট নিয়ে বাস্-এর জায়গায় যখন হাজির হলাম তখন সবেমাত্র ফরসা হয়েছে। একটু অপেক্ষা করতে হল। একটা বাস্ ভরতি হয়ে গেল। টিকিট কেটে আমরা আর একটা বাস্-এ উঠে বসলাম। মাল ওজন করার একটা কথা উঠল, কিন্তু তা হলে দেরি হয়ে যায়। শেষে অনেক লোক দেখে আর আপত্তি রইল না, অমনই ছাড়া পাওয়া গেল। একে একে ভরতি বাস্ ছাড়তে লাগল। আমাদের বাস্ ছাড়ল সকাল সওয়া ছয়টায়। হৃষীকেশের প্রান্তসীমায় পরীক্ষা করা হল, কার কলেরার টিকে দেওয়া আছে, কার নেই। যাদের নেই তাদের 'সুই' ফুটিয়ে দেওয়া হল। মাইল তিনেক দূরে লছমনঝোলা। এখানে গাড়ি আধঘণ্টা খানেক থেমে রইল। আমরা নেমে একটু চা খেয়ে নিলাম।

লছমনঝোলা থেকেই আসল পাহাড়ের রাস্তা শুরু হল। আগে লোকে হরিদ্বার থেকেই পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করত, কিন্তু আসল চড়াই উতরাই আরম্ভ হত বোধ হয় এই লছমনঝোলা থেকেই। তার আগে রাস্তাটা মোটামুটি অনেকটা সমানই ছিল। লছমন-ঝোলায় লক্ষ্মণ-মন্দিরের সামনে গঙ্গার উপরে মোটা লোহার তার দিয়ে দুই-পাড়ে আটকানো ঝোলা-পুল। আগে এখানে দড়ির ঝোলানো পুল ছিল। এই ঝোলা-পুল থেকেই এখানকার নাম লছমনঝোলা হয়েছে। এই রকম পুল এখানকার সর্বত্র। এখন-কার পুলগুলি শক্ত ও মজবুত। লোকের চলা-চলতিতে অল্প অল্প দোলে। আগেকার পুল ছিল মোটা দড়ি, বাঁশ, কাঠ ও লতা-

পাতা দিয়ে তৈরি। এখনও তার নমুনা ছুটো-একটা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি এত দোলে যে এক সঙ্গে ছুধার থেকে ছুজন লোকের পার হওয়া মুশকিল। বিশেষ অনভ্যস্ত নতুন যাত্রীর পক্ষে এই পুলে ভার-সমতা রক্ষা করে চলা কঠিন।

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। 'জয় বদরী বিশাল', 'বদরী বিশাল লাল কী জয়' বলে আমরা পাহাড় চড়তে শুরু করলাম। চলতি গাড়িতে মেয়েরা গান জুড়ে দিলেন,

আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার ॥

সকলে কিছু গান জানেন এমন নয়। সকলের গলায় সুর ছিল তাও নয়। তবুও ভাবের আবেগে প্রাণ থেকে গান বেরিয়ে এল। মন-উদাস-করা গান। পুরোনো সঞ্চয় সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে অনিশ্চিত নতুনের আকর্ষণে যাত্রা করার গান। নূতনের এক ঝলক আলো যেন গাড়ির মধ্যে খেলে গেল। সেই আলোকে যাত্রীরা সকলে নতুন হয়ে দেখা দিল। সকলেই পথিক। কারুরই যেন কোন সঞ্চয়ের বোঝা নেই। পথেরও কোন মোহ নাই। কেবল পথ-চলারই আনন্দ। মনের মধ্যে বাজতে লাগল, তোমারে করি নমস্কার,······করি নমস্কার, ·····নমস্কার।

আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে পাহাড়ের সার চলেছে। মাঝখানে সঙ্কীর্ণ গিরিনদী গঙ্গা। বাঁ দিকের পাহাড়ের গায়ে গায়ে আমাদের রাস্তা। রাস্তার ডান পাশেই খাদ, পাহাড় নেমে গিয়েছে গঙ্গা পর্যন্ত। গঙ্গার পরপারে আর এক সার পাহাড়। আঁকা-বাঁকা রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে, কখনও উঁচু কখনও নিচু। চড়াই আর উতরাই। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে একটা পাহাড় অতিক্রম করে আর একটা পাহাড়, সেটা ছাড়িয়ে আর একটা,

আর একটা, এমনই করে ক্রমাগত পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে চলেছি। একটা পাহাড় থেকে আর একটা পাহাড়ে যেতে হলে একেবারে কোন উপনদী বা খাদের কাছ পর্যন্ত নিচুতে নেমে যাচ্ছি। আবার সেখান থেকে অনেকখানি উঁচুতে উঠতে হচ্ছে। কোন জায়গায় পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠা, কোন জায়গায় আবার তেমনই ঘুরে ঘুরে নিচে নামা। বাঁকের পরে বাঁক, কেবলই বাঁক।

আমাদের বাঁয়ে পাহাড়ের দেওয়াল। পাহাড়ের গায়ে নানা-রকম গাছপালার ঘন জঙ্গল। গাড়ির ভিতর থেকে সেদিকে বেশি দূর বা বেশি উঁচুতে দৃষ্টি চলে না। ডাইনে নদীর ওপারে পাহাড়ের সার। কোনোটা উঁচু, কোনোটা বা নিচু, কোনোটা ঢালু হয়ে নদী পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেখানে উপরে ও নিচে পাহাড়ের কোলে স্তরে স্তরে চাষের জমি দেখা যাচ্ছে। তারই মধ্যে গ্রামবাসীদের বসতি। গ্রাম থেকে পগদণ্ডি নিচে নেমে এসেছে বা উপরে উঠে গিয়েছে। মাঝে মাঝে পারাপারের জন্য দুটো একটা পুরোনো ধরনের পুল। পাহাড়ের গায়ে কেদারবদরী-যাত্রীদের প্রাচীন আমলের পায়ে-চলা পথটা দেখা যাচ্ছে। পথটা যে চওড়া এ পার থেকে তা বোঝাই যায় না। মনে হয় সরু এক ফালি পায়ে-চলা পথ যেন পাহাড়ের গায়ে ঝুলে রয়েছে। কিছু কিছু যাত্রী সেই পথে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেছে। দূর থেকে তাদের খুবই ছোট দেখাচ্ছে। মনে হল, কিছু দূর এগিয়ে ঐ রকম এক পথে আমাদেরও চলতে হবে। এপার থেকে সমস্তটাকেই একটা ছবির মত দেখাচ্ছে।

দেখতে দেখতে চলেছি। গঙ্গা বরাবর পাশে পাশে।/কোথাও সরু, কোথাও একটু চওড়া। পাহাড়ের ভেতর যেখানে যেমন জায়গা পেয়েছে সেখানে সেই রকম নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। নিচের দিকে চেয়ে দেখতে রীতিমত ভয় করে। মনে হয়, গাড়ি একটু বেচাল হলেই একেবারে সশরীরে স্বর্গলাভ। রাস্তায় দুটো

একটা উপনদী পার হলাম। শিবপুরী, গুলার, আরও কি কি নাম। শিবপুরীর কাছে শুনলাম, বশিষ্ঠ গুহা নামে এক গুহা আছে। উপনদীর উপরকার মোটর-রাস্তার পুলগুলি বেশ শক্ত-সমর্থ, ঝোলাপুলের মত নয়। হৃষীকেশ থেকে তেইশ মাইল দূর ব্যাসীতে এসে গাড়ি থামল।

ব্যাসী একটা গেট অর্থাৎ দুই দিকের গাড়ি 'পাস' করার জায়গা। পাহাড়ের রাস্তা এত চওড়া নয় যে দুই দিকের গাড়ি পাশাপাশি একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারে। সেইজন্য পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে যেখানে চওড়া জায়গা পাওয়া যায় সেখানে এক দিকের গাড়ি আটক করে রাখা হয়। উল্টো দিকে পরের গেট থেকে যতগুলি গাড়ি ছেড়েছে, সেগুলি এই গেটে না পৌঁছা পর্যন্ত এই দিকের গাড়িগুলি আটক থাকে। ওগুলি সব এসে পড়লে এদিককার গাড়ি ছাড়া হয়। তাই ব্যাসী-গেটে সকাল সাড়ে আটটা থেকে সওয়া নয়টা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হল। ব্যাসীতে নদী একটু দূরে সরে গেছে। তাই পাহাড় আর নদীর মাঝখানে খানিকটা চওড়া জায়গা পাওয়া গেছে, কাছেই একটি ছোট বসতি; কাছাকাছি কোথাও না কি ব্যাস মুনির আশ্রম ছিল। সম্ভবত তাই থেকে বসতি ও এই জায়গাটির নাম ব্যাসী হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে বন। আমাদের রাস্তা ও নদীর মাঝামাঝি জায়গায় বন। কোন দিকে ফাঁকায় দৃষ্টি চলে না। বেশ ছায়ায় ঢাকা নিরিবিলি জায়গাটি। অনেকগুলি গাড়ি ও যাত্রী একত্র হওয়াতে এই জনবিরল স্থানটি সহসা যেন একটু চঞ্চল ও কলরবমুখর হয়ে উঠল। ছোট একটি চায়ের দোকান। বোধ হয় একান্তই সাময়িক। সেখানে ড্রাইভাররা চা খেল। আমরা একটু হাঁটা-চলা ও বিশ্রাম করলাম। আমাদের চা-সাহেব ও সুবোধবাবু ছবি তুললেন।

ও দিকের সব গাড়ি এসে পড়লে প্রায় তিন পোয়া-ঘণ্টা বাদে

আমাদের গাড়ি ছাড়ল। ব্যাসী থেকে দেবপ্রয়াগ কুড়ি মাইল। আবার সেই চড়াই উতরাই। গঙ্গা আমাদের পাশে পাশে চলেছে। মাঝে মাঝে ছোটো-খাটো গিরিনদী পার হয়ে চলেছি। আমাদের সামনে-পেছনে অনেকগুলি বাস্ চলেছে। পেছনের বাস্গুলিকে আমরা বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না। সামনের বাস্খানাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি। এক এক বার বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাঁকের আড়াল পার হলে এক এক বার দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ছোট আকারের একটা কিছু যেন পাহাড়ের গায়ে ঝুলে ঝুলে ছুটে চলেছে। দূর থেকে সামনের বাঁকের দিকে চেয়ে মনে হয় না যে, সেখান দিয়ে আমাদের গাড়ি পার হতে পারবে।

দেবপ্রয়াগ

দূর থেকে ওপারে দেবপ্রয়াগ শহর দেখা গেল। একবার ঢাকা পড়ে, আর একবার দেখা যায়। যাত্রীরা সব 'গঙ্গা মাই কী জয়' ধ্বনি দিয়ে উঠল। একটু কাছে যেতে দেখি, আর একটা বড় নদী গঙ্গায় এসে পড়েছে। তুই নদীর মাঝখানে যেন শহরটা। বেলা প্রায় এগারোটায় আমাদের গাড়ি দেবপ্রয়াগের এপারে এসে থামল। আমরা মনে মনে প্রয়াগের উদ্দেশে প্রণাম জানালাম।

বাস্ থেকে নেমেই দেখি, সামনে গঙ্গার উপরে এক বড় ঝোলা-পুল। পুল পার হয়ে দেবপ্রয়াগ শহর ও বাজারের ভিতর দিয়ে গিয়ে শহরের আর এক প্রান্তে অলকনন্দার উপরেও ঐ রকম আর একটি ঝোলা-পুল পাওয়া গেল। সেটি পার হয়ে, পাহাড়ের গায়ে একটু উপরে উঠে, কালি কমলিওয়ালার ধরমশালা। ধরমশালায় বেশ ভিড়। দোতলায় জায়গা পাওয়া গেল না। পরচার জোরে

একতলায় একটা ছোট অন্ধকার ঘর ও পাতবার একটা সতরঞ্চি পাওয়া গেল। আমাদের ঘর অনেকগুলি পাশাপাশি কুঠুরির মধ্যে একটি। সামনে লম্বা বারান্দা। তারও আনুপাতিক ভাগ একটা পাওয়া গেল। মেয়েরা ঘরে আর পুরুষেরা বারান্দায় আড্ডা জমিয়ে বসলাম। রান্না করার আর সময় ছিল না। এ দিকে প্রচণ্ড গরম। অলকনন্দায় স্নান করে শরীর স্নিগ্ধ হল। পুরী-তরকারি খেয়ে সে-বেলার মত বিশ্রাম করা গেল। বেলা একটু পড়লে দেবপ্রয়াগ দেখতে বের হলাম।

এদিককার মধ্যে দেবপ্রয়াগ বেশ বড় জায়গা। অলকনন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে দেবপ্রয়াগ। পাহাড়ে দিক ঠিক করা কঠিন, তবুও মনে হয় পূব দিক থেকে পশ্চিমমুখী হয়ে অনেক দূর এসে অলকনন্দা এখানে দক্ষিণমুখী হয়ে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দেবপ্রয়াগের আসল শহরটি এই দুই নদীর মাঝখানে একটি ছোট পাহাড়ের মাথার উপরে। পাহাড়টি উঁচু-নিচু অসমান হলেও মালভূমির মত অনেকখানি ছড়ানো। তারই উপরে শহরটি। অলকনন্দা পার হয়ে অপর পারেও আর একটি পাহাড়ের গায়ে শহরটি কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে। এই দিকেই একটু উঁচুতে উঠে কালি কমলিওয়ালার ধরমশালা। এই জন্য এই শহরে দুই নদীর উপরে দুটি ঝোলা-পুল। বাস্-রাস্তা থেকে গঙ্গার উপরকার পুল পেরিয়ে শহরে ঢুকতে হয়। আবার অলকনন্দার পুল পার হয়ে শহরেরই আর একটা মহল্লায় যেতে হয়। দুই দিক নিয়েই পুরো শহর।

এখানে অনেক লোকের বাস। তাদের রাস্তা, ঘরবাড়ি, ঘরের চাল সবই নানা রকমের পাথর দিয়ে তৈরি। বদরিকাশ্রমের পাণ্ডারা এই দেবপ্রয়াগেরই বাসিন্দা। বদরিকাতে গ্রীষ্মের ছয় মাস মন্দির খোলা থাকে। তখন এরা সেখানে চলে যায় ও যাত্রী নিয়ে এই পথে যাতায়াত করে। বদরীনাথেও এদের অনেকের বাড়ি

আছে। শীতের ছয় মাস বদরীনাথের মন্দির ও শহর বন্ধ হয়ে যায়। চার দিক বরফে ঢাকা পড়ে। যাত্রীদেরও যাতায়াত থাকে না। তখন এরা দেবপ্রয়াগে নেমে আসে। এখানে বাজার ও দোকানপাট মন্দ নয়। বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী আছে। তার জন্য যাত্রীদের কাছে এরা চাঁদা আদায় করে।

অলকনন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমটি বেশ সুন্দর। অলকনন্দা অনেক দূর থেকে প্রায় সমতলে ঢালু হয়ে এসে এখানে নিচুতে নেমেছে। তার মুখেও বেশি পাথরের বাধা নাই। তাই তার গতি নিঃশব্দ। গতিতে বেগ আছে কিন্তু গর্জন নাই। গঙ্গার যতটুকু দেখতে পাওয়া গেল, দেখা গেল গঙ্গা অনেকটা উঁচু থেকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। বরাবর তার মুখে পাথরের বাধা। উপলপ্রতিহত হয়ে তার গতি হয়েছে ঘোরালো ও প্রবল, স্রোতও হয়ে উঠেছে তরঙ্গসঙ্কুল ও গর্জনমুখর। ভারতে নদীসঙ্গমকে বরাবরই পুণ্যস্থান বলে মনে করা হয়েছে এবং পুরাকালে সে সকল স্থানে মুনিঋষিরা বা ধর্মপরায়ণ রাজারা ধ্যান, ধারণা, তপস্যা করেছেন, যাগযজ্ঞও করেছেন। তাতে করে এই সকল প্রয়াগের মাহাত্ম্য আরও বেড়ে গিয়েছে। কেদার-বদরীর পথে অসংখ্য নদীসঙ্গম, কিন্তু সবগুলি প্রয়াগের মর্যাদা পায় নাই। কেন পায় নাই বলা কঠিন। কিন্তু যেগুলি পেয়েছে সেগুলিতে আমরা দেখতে পেয়েছি দুইটি নদীর সঙ্গম অথচ পাণ্ডারা সর্বদাই ব্যাখ্যা করেছে, সেগুলি তিনটি নদীর সঙ্গম। একটি লুপ্ত নদীর অস্তিত্ব সর্বদাই কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। কেন এরূপ করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি নাই। হয়তো তিনটি নদীর সঙ্গমের নামই প্রয়াগ, অথবা তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলকে বেশি পবিত্র মনে করা হয়। এমনও হতে পারে যে এলাহাবাদ-প্রয়াগের অনুকরণে পরবর্তীকালে এই সকল প্রয়াগেও অস্তিত্ববিহীন তৃতীয় একটি লুপ্ত-নদীর আরোপ করা হয়েছে। কারণ যাই হোক, ঘটনাটি এই যে, নদীসঙ্গমগুলির সর্বত্রই দুইটি নদীর

সঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও কতকগুলিকে প্রয়াগ বলা হয় আর কতকগুলিকে বলা হয় না। এই সকল প্রয়াগের মধ্যেও পঞ্চ প্রয়াগ বিখ্যাত। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ। এই সকল প্রয়াগে, স্নান, পূজা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে হয়।

হৃষীকেশ থেকে অনেক চড়াই-উতরাই করে দেবপ্রয়াগে আসতে হল বটে কিন্তু আসলে দেবপ্রয়াগ ও হৃষীকেশের উচ্চতার তফাত বোধ হয় খুব বেশি হবে না। তাই এখান থেকে নিচুতে হরিদ্বারের দিকে গঙ্গার ঢাল বেশি বলে মনে হল না। দেবপ্রয়াগ থেকে গঙ্গার ধারে ধারে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর রাস্তা, আর অলকনন্দার ধার বরাবর কেদার-বদরীর পথ। গঙ্গোত্রীর পথে কিছুদূর গিয়ে আবার যমুনোত্রীর পথ আলাদা হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গমের কাছে নেমে গেলাম। গঙ্গার অশ্রান্ত কলরোল ও তুরন্ত প্রবাহ আর অলকনন্দার নিঃশব্দ ক্ষিপ্র গতি। দেখতে বেশ লাগল। এখানে বসে বসেই আনন্দে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। বৈকালে তর্পণ আর হল না। অঞ্জলি করে জল মাথায় দিলাম। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে অঞ্জলি পূর্ণ করে জল নিবেদন করলাম। নিমেষের জন্য অতীতের যোগসূত্রে যেন একটু টান পড়ল। মনে হল, যেখানে জল সেখানেই তার চার পাশে প্রাচীনকালে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। জল নারায়ণ। তাই প্রাকৃতিক জলধারার মর্যাদা দিয়েছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষেরা। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল সহজ ও সুন্দর। সভ্যতার সেই প্রত্যূষ-মুহূর্তে যেন ক্ষণকালের জন্য ফিরে গেলাম।

ঘাটে জলের তোড় ও স্রোতের আবর্ত বেশি বলে পাহাড়ে-আটকানো মোটা মোটা লোহার শিকল নদীর ভিতরে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই শিকল ধরে যাত্রীরা অল্প জলে ডুব দেয়।

বেশি জলে যাওয়া নিষেধ। বৈকালেই সকলে সেখানে স্নান করলেন। আমাদের চীনে অধ্যাপকটি আটান্ন বৎসরের যুবক। উৎসাহও অফুরন্ত। অপরাহ্ণ বেলায় গামছা পরেই সঙ্গমে ডুব দিলেন। ঘাটের উপরেই শ্রীরঘুনাথজীর প্রাচীন মন্দির। আমরা রঘুনাথজীর দর্শন ও মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা পয়সার জন্য ঘিরে ধরল। রঙ ফরসা, নাক মুখ চোখ সুন্দর। ভিক্ষা এদের উপজীবিকা নয়, কিন্তু যাত্রীদের কাছে পয়সা চাওয়া এদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

কীর্তিনগর

ফেরার পথে কেরোসিন তেল কেনা হল, স্টোভটাও সারিয়ে নিলাম। হৃষীকেশের কেনা মুগের ডাল ও কিছু তরকারি ছিল। রান্নার স্থানাভাব। স্টোভে একপাকে খিচুড়ি হল। পর দিন বেলা দশটায় বাস্ ধরতে হবে কীর্তিনগর হয়ে শ্রীনগর যাবার জন্য। দেবপ্রয়াগে কুলিদের বড় আড্ডা। রাত্রেই কুলি ঠিক করতে হল। আমাদের নয় জনের মালের ওজন হল পাঁচ মন চৌত্রিশ সের। পাঁচজন কুলি নিতে হল। হরকে বাহাদুর, ধন বাহাদুর, গল্পে মান্না, ধনবীর আর ডবল বাহাদুর। এরা সকলেই নেপালী। এই সময়ে এখানে কাজ করতে এসেছে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারবদরী ঘুরে রুদ্রপ্রয়াগে ফেরত পৌঁছে দেবার মোট মজুরি ঠিক হল মন পিছু এক-শ টাকা। তা ছাড়া রাস্তায় দু-এক দিন কোথাও অপেক্ষা করা হলে সেই সময়ে এদের দৈনিক জনপ্রতি একসের করে আটা খোরাকি হিসেবে দিতে হবে।

পরদিন সকাল সকাল খিচুড়ি খেয়ে অলকনন্দা ও গঙ্গা পার

হয়ে আবার আমাদের পুরোনো বাস্-এর রাস্তায় আসতে হল। বেলা দশটায় কীর্তিনগরের বাস্ ছাড়ল।

দেবপ্রয়াগ থেকে কীর্তিনগর কুড়ি মাইল। গঙ্গার ধার দিয়ে কিছু দূর গিয়ে গঙ্গা পার হয়ে অলকনন্দার পারে পড়তে হয় ও প্রায় সমস্ত রাস্তাটাই অলকনন্দাকে ডান ধারে রেখে চলতে হয়। রাস্তা ভাল নয়। আমাদের বাস্ বেশ লাফাতে লাগল। একটু বেচাল হলেই একেবারে নদীগর্ভে। একটা বড় চড়াই-এর মুখে গাড়ির এঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল এবার পেছু হটে গাড়ি একেবারে খাদে নেমে যাবে, কিন্তু গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভারের সহকারী গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ও তুটো কাঠের ভারি মুগুর পেছনের চাকাতুটোর নিচে লাগিয়ে দিলে।

অনেক চড়াই-উতরাই ভেঙ্গে বেলা তুটোয় বাস্ এসে কীর্তিনগরে পৌঁছল। এধারের পাহাড়ে গাছপালা বেশি দেখা গেল না। বাঁ ধারে পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে রুক্ষ ও উষর। গায়ে তাদের শ্যামল কোমলতা নাই। পাহাড়ের বন্ধুর ধারালো গায়ে ধাক্কা লাগলে বাস্ তখনই চূর্ণ হয়ে যাবার কথা। বাস্-এর রাস্তাটাও বেশ বিপজ্জনক ও তুরারোহ। ওপারে যাত্রীদের পায়ে-হাঁটা পথটি পাহাড়ের গায়ে ঝুলে রয়েছে। অলকনন্দা সঙ্কীর্ণ তুই দিকের পাহাড়ের চাপে ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে হতে চলেছে।

এধারের বাস্ কীর্তিনগরে এসেই শেষ হয়েছে। এখান থেকে অলকনন্দা পার হয়ে চার মাইল হেঁটে শ্রীনগরে যেতে হবে। কীর্তিনগর পাহাড়ের গায়ে খুব ছোট জায়গা। একটুখানি বাজার, পোস্টাফিস, কয়েকখানা বাস্ দাঁড়াবার জায়গা ও যাত্রীদের একটা বিশ্রাম-ঘর। পাহাড়ের গায়ে উঠে তুই একখানি ছোট্ট বাড়ি দেখা যায়। ছোট্ট একটু গাঁয়ের মতই আছে।

বেলা তুটোয় এসে এখানে পৌঁছলাম। ভীষণ রোদ। প্রচণ্ড গরম। নিকটে গাছের ছায়া নাই। বিশ্রাম-ঘরটার মেজে পাকা,

উপরে টিনের চাল। টিন যেন আগুন ছড়াচ্ছে। তবু তারই মধ্যে আশ্রয় নিতে হল। একটা সিমেণ্টের বেঞ্চিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু নিদ্রার আবেশও হল।

অল্প পরেই জেগে দেখি পাহাড়ের এক বুড়ি এসে জুটেছে। সারা গায়ে গয়না। বেশভূষাও একটু সম্পন্ন ধরনের। তার সুচ চাই। এক সময়ে এখানে সুচসুতো দুষ্প্রাপ্য ছিল। সমতলের তীর্থ-যাত্রীরা তখন পর্বত-বাসিনীদের জন্য সুচসুতো সঙ্গে নিয়ে আসত। এখন সুচসুতো সুলভ হয়েছে কিন্তু রেওয়াজটা রয়ে গেছে। আমরা বুড়িকে সুচসুতো দিলাম। দেখাদেখি আরও কয়েকটি মেয়ে এসে জুটল। তারা সত্যই গরিব। পয়সার খুব অভাব। তাদেরও সুচসুতো দেওয়া হল।

দেখা গেল তাদের কথাও আমরা বুঝি না, আমাদের হিন্দিও তারা বোঝে না। তবুও মেয়েরা ঠারেঠোরে তাদের সঙ্গে আলাপ চালাতে লাগলেন। বুড়ির কথায় বোঝা গেল তার ছেলে-মেয়েরা সমর্থ। ছেলেরা খেতি ও অন্যান্য কাজ-কর্ম করে। মনে হল অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালই। অন্য মেয়েগুলির অবস্থা খুবই খারাপ মনে হল। এরা মেয়ে-পুরুষে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারে না, অথচ কত অল্পেই না এরা সন্তুষ্ট। পরনে অনেকেরই দেখলাম নিজেদের হাতে কাটা সুতোয় তৈরি ভেড়ার কম্বলের ঘাগরা। হয়তো পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় ঘাগরা নেই।

মেয়েরা আলাপ চালাতে লাগলেন। আমি সেখান থেকে উঠে পড়ে চা-সাহেব ও সুধীরবাবুর খোঁজে গেলাম। তাঁদের আর খুঁজে পাই না। সামনের একটা রাস্তা বেয়ে উপরে উঠে দেখি এক হরিজনের বাড়িতে দড়ির খাটিয়ায় অঙ্গ প্রসারিত করে তাঁরা আরাম করছেন, আর গৃহস্থের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করছেন। গৃহস্থটি বুদ্ধিমান, ভব্য-সব্য লোক। তার এক ছেলে শ্রীনগরে কাজ করে, আর একটি শ্রীনগরে থেকেই ইস্কুলে পড়ে। লোকটি হিন্দি বলতে

পারে। বললে, হরিজন বলে ওখানকার লোকেরা ওদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। ওদের বাড়িতে গেলাম বলে আমাদের উপর খুব খুশি। ছেলেদের ও বাড়ির কর্তার এক সঙ্গে ফটো তোলা হল। ওদের ঠিকানাও নেওয়া হল, ফিরে এসে ওদের ছবি পাঠাতে হবে। ছবি পাওয়ার নামে সকলেই খুব খুশি।

বেলা পড়ে এল। এক দোকানে চা খেয়ে নিয়ে আমরা পায়দলে বেরিয়ে পড়লাম। অলকনন্দার পুল পার হয়ে ওপারে প্রায় সমতল রাস্তায় পড়লাম। এ জায়গা সমুদ্রজলের উপর থেকে প্রায় ষোলো-সতেরো শ ফুট উঁচু। এখান থেকে এ একটা বড় উপত্যকা আরম্ভ হল। বাঁয়ে অলকনন্দা ক্রমে চওড়া হয়ে গেছে। সাদা বালুকাময় তীরভূমি। মাঝে কালো জল। স্রোত আছে কি নাই ভাল করে বোঝা যায় না। অপরাহ্লের নিস্তেজ আলোকে একখানি শান্ত স্তব্ধ ছবির মত মনে হল। অবিশ্রান্ত কলরবমুখর দুর্দান্ত গিরিনির্ঝরিণী যেন সমতলের শান্ত পরিবেশকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে।

রাস্তার ডান দিকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত পাহাড় চলল। একদল পাহাড়ি শ্রমিক পাহাড় ভেঙ্গে গাড়ি যাবার জন্য রাস্তা চওড়া করছিল। বলল, অলকনন্দায় নতুন পুল তৈরি হবে। তার পর কীর্তিনগর ও শ্রীনগরের সঙ্গে মোটরবাস্-এ যোগাযোগ হবে। শ্রীনগরের সঙ্গে কোটদ্বার রেলস্টেশনের মোটরের যোগাযোগ আছে। কীর্তিনগর ও শ্রীনগরের মাঝখানকার এই রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেলে ও নদীতে নতুন পুল তৈরি হলে এদিকে হৃষীকেশ বা হরিদ্বার রেলস্টেশনের সঙ্গেও শ্রীনগরের মোটর-যোগাযোগ সম্পূর্ণ হবে। কিছু দূর গিয়ে ডান দিকের পাহাড়ও সরে গেল। অনেকটা খোলা জায়গা। মাঝে মাঝে ফণিমনসার জঙ্গলে ঘেরা পোড়ো মন্দির বা লোকের বাড়ি। এ রকম মন্দির অনেক। কতকালের তা কে জানে?

রাস্তা থেকে অন্য দিকে কিছু দূর গেলে পাহাড়ের উপর না কি বিল্বকেদার শিবের মন্দির ও উলটো দিকে মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যার জায়গা। মার্কণ্ডেয় মুনি দেবীর ধ্যানে তপস্যা করেছিলেন। শুনলাম সেখানে একটি পার্বত্য নদী এসে অলকনন্দায় পড়েছে। জায়গাটি সুন্দর কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের শ্রীনগর পৌঁছতে হবে, কাজেই বিল্বকেদারে আর যাওয়া গেল না। রাস্তায় শ্রীনগরের ফিরতি অনেক নরনারীর সঙ্গে দেখা হল। শ্রীনগর বড় জায়গা। অনেক জায়গার লোক সেখানে বাস করে। অনেক লোক কাজ কারবারে সেখানে যাতায়াত করে। যাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল তাদের চেহারা একরকমের নয়। সকলের মুখেচোখে পাহাড়িদের বিশিষ্ট ছাপ নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ার আগেই শ্রীনগরে পৌঁছে গেলাম।

শ্রীনগর

৮ মে তারিখে সন্ধ্যার আলো থাকতে থাকতে শ্রীনগরে এসে ঢুকলাম। ঢোকার মুখে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আমাদের 'সুই ফোটানো'র পরচা দেখাতে হল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লোকেরা কিছু 'টি. বি. সিল'ও আমাদের কাছে বিক্রি করলে। সুবোধবাবু বরাবর আমাদের আগে চলেন। তাঁর কাছে পরচা ছিল না। তাঁকে এরা আটকে ছিল। তিনি কিছু 'টি. বি. সিল' কিনে পেছনে আমাদের উদ্দেশে বরাত দিয়ে ঘাটি পার হয়ে যান।

আমাদের আগে পৌঁছেছিলেন বলে সুবোধবাবু শ্রীনগর থেকে এক মাইল এদিকে কমলেশ্বর শিবের মন্দির দেখে যাবার সময় পান। আমরা আর সে সময় পাই নাই। কমলেশ্বরের নিকটেই পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির। কমলেশ্বরের মন্দিরই একটু বেশি প্রাচীন।

রামায়ণে কমললোচন রঘুপতি রামচন্দ্রের নীলপদ্মে দেবীর অর্চনা করা এবং নীলপদ্ম কম পড়ায় নিজের পদ্মনেত্র উৎপাটন করে পূজোয় দিতে উদ্যত হওয়ার যে কাহিনী প্রচলিত আছে, এখানে দেবীর পরিবর্তে শিবকে অবলম্বন করে সেই কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়েছে।

সে যাই হোক, সন্ধ্যায় শ্রীনগরে পৌঁছেই বাসস্থানের সন্ধানে লেগে যেতে হল, কেন না অন্ধকার হওয়ার আর বেশি দেরি ছিল না। চটিতে কোথাও জায়গা পাওয়া গেল না। কালি কমলিওয়ালার বিরাট ধর্মশালা—লোক গিসগিস করছে। আধুনিক প্রথার ছুটো একটা হোটেল আছে। সেদিকে নজর দিতে আর ইচ্ছা হল না। কালি কমলিওয়ালার ধরমশালাতেই গিয়ে ঢুকলাম। দোতলায় একটা অন্ধকার ঘর। পাতবার কিছু পাওয়া গেল না। সামনের বারান্দা লোকে ভরতি। মেয়েদের উপর ঘরের আর বাজারের ভার দিয়ে আমরা চারদিকটা একবার ঘুরে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু দেখে নেওয়া যায়।

চার দিকে পাহাড়ে-ঘেরা একটা বড় উপত্যকার মধ্যে শ্রীনগর শহর। বেশ বড় জায়গা। শহরের গা বেয়ে নদী। নদীর গর্ভ একটু চওড়া হয়েছে, বালুকাময় তীরভূমিও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু জলে বেগ নাই, যেন সমতলে বয়ে চলেছে। শ্রীনগর সমুদ্রজল থেকে যোলো শ ফুট উঁচু মাত্র। শ্রীনগর এক সময়ে টেহরি গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল। এখনও বেশ বড় বাজার আছে। নানারকম জিনিসের বড় বড় দোকানপাট। তরকারিও নানা রকমের পাওয়া যায়। এই সময়েও আলু, কুমড়ো, লাউ আর বাঁধাকপি দেখলাম। শুকনো বেগুনও দেখা গেল। বেগুন আর লাউ মনে হল নিচে থেকে চালান এসেছে। নানারকমের শুকনো ফল। তাজা তরমুজও দেখতে পাওয়া গেল। শহরের মাঝখানে একটি ছোট গোল পার্ক। তাতে ফোয়ারাও আছে। নদীর ধারে একটা খোলা বড় মাঠ।

সেখানে ইস্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলে। পাহাড়ে উঠে অবধি এত বড় সমান মাঠ কোথাও দেখি নাই।

বাস্-এর এখানে বড় আড্ডা। এখান থেকে কোটদ্বার স্টেশন পর্যন্ত বাস্ চলে। কোটদ্বার এখান থেকে পঁচাশি মাইল। হরিদ্বারের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে। কীর্তিনগর পর্যন্ত হৃষীকেশের বাস্ আসে। কীর্তিনগর থেকে শ্রীনগর মাত্র চার মাইল। বাস্ওয়ালাদের হঠাৎ কোন কিছুর দরকার হলে শ্রীনগর পর্যন্ত আসতে হয়। এখান থেকে আবার রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে চমোলি বা লালসাঙ্গা পর্যন্ত বাস্ চলে, মোট ষাট মাইল।

শ্রীনগরে অনেক মন্দির। তার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরই প্রসিদ্ধ। প্রায় দু শ বছর আগে এই মন্দির তৈরি হয়। চার শ বছর আগে না কি লক্ষ্মী-নারায়ণের আর একটি বড় মন্দির ছিল। তার সামনে চমৎকার একটি গরুড় মূর্তি ছিল। নতুন মন্দিরের গরুড়টি দেখতে মোটেই ভাল নয়। নতুন গরুড়কে দেখে পুরোনো গরুড় লজ্জা পেয়ে পাখা মেলে উড়ে চলে যান। প্রাচীন মন্দিরটি এখন ভাঙ্গা অবস্থায় ফণিমনসার জঙ্গলে ঢাকা পড়ে রয়েছে।

বর্তমান শহরটি প্রাচীন নয়। প্রাচীন শহরটি বোধ হয় আরও দক্ষিণে ছিল। পথে জঙ্গলে ঢাকা যে সকল পোড়ো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আমরা ফেলে এসেছি, প্রাচীন শহর বোধ হয় সেই দিকেই প্রসারিত ছিল। রাজা অজয়পাল ১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দে এই শহরের প্রথম গোড়াপত্তন করেন। প্রায় দু শ আড়াই শ বছর আগে সেই প্রাচীন শহরের অদলবদল হয়। তার পরে আনুমানিক বছর পঞ্চাশেক আগে এই অঞ্চলে প্রবল বন্যা নামে। বন্যার ফলে শহরটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়, মন্দিরগুলি ভেঙ্গে যায়। শুধু এই শহর নয়, বদরীনারায়ণের নিচু পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলই অল্পবিস্তর পরিমাণে এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা এক দিকে যেমন প্রাচীন কীর্তিকাহিনী ধ্বংস করে, তেমনই শতাব্দীর সঞ্চিত পুঞ্জীভূত জঞ্জালও

ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সমস্ত অঞ্চলকে যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয় ও নূতন সৃষ্টির পথ সুগম করে তোলে। বন্যার পরে শ্রীনগর শহরটিকে সরিয়ে নতুন জায়গায় নতুন করে তৈরি করা হয়। মন্দিরের ছড়িয়ে-পড়া মাল-মসলা কুড়িয়ে বাড়িয়ে আবার মন্দির তৈরি করা হয়। আর এখানে সেখানে অনেক ভাঙ্গা মন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। আমরা আসার সময় সেইগুলিকেই রাস্তার ধারে ধারে ফণিমনসার জঙ্গলে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পাই।

বস্তুত অজয়পালের নগর প্রতিষ্ঠার আগেও এমন জায়গায় নিশ্চয়ই লোকবসতি ছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য দেবপ্রয়াগ হয়ে এই পথে এসেছিলেন। তার আগে বৌদ্ধসন্ন্যাসীরাও সম্ভবত এই পথে হিমালয়-অভিযান এবং হিমালয়োত্তর প্রদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারে যাত্রা করে থাকবেন। সম্ভবত আর্যযুগ বা তারও প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে উত্তর-ভারতের সমতল প্রদেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সকল ঢেউ উঠেছে তার ধাক্কা এই পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত এসে পোঁছেচে। তা ছাড়া প্রাচীন যুগের পার্বত্য লোকেদেরও একটা নিজস্ব বিশিষ্ট রীতিপদ্ধতি, জীবনযাত্রার বিশেষ ভঙ্গি, ধর্মবিশ্বাস নিশ্চয়ই ছিল। সে সকল এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই এখানে নির্বিচারে সকল দেবতারই ঠাঁই হয়েছে। এই সব অঞ্চলে ভাল করে খোঁজ-খবর করলে ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুগের নানারকম উপাদান পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

অন্ধকার হতে না হতে ধরমশালায় ফিরে এলাম। তরমুজ খেয়ে টর্চ নিয়ে সুধীরবাবু ও আমি পায়খানা তদারক করতে বেরোলাম। দেখলাম জল ও পায়খানার বন্দোবস্ত খুব ভাল। এটা অবশ্য ধরমশালা-কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা, কিন্তু শ্রীনগর শহরের সর্বত্রই স্বাস্থ্যবিধি-পালনের যে সকল ব্যবস্থা উত্তর-প্রদেশ সরকার করেছেন তা সত্যই প্রশংসা করবার মত।

ধরমশালার সর্বত্রই যাত্রীর ভিড়। বাঙালী ছাড়া, অন্য অঞ্চলের

লোকেরা প্রায় সকলেই দিনের আলোতে খাবার-তৈরি ও খাওয়া দাওয়ার কাজ সেরে নিয়েছেন। দু চার দল তখনও অর্ধ-অন্ধকারে রুটি-তরকারি তৈরি করছেন। আমরা উপরের ঘরেই স্টোভে খিচুড়ি তৈরি করে নিলাম। এ সব বিষয়ে রেণুর কৃতিত্ব অসাধারণ। সুবোধবাবু এক ফাঁকে বাস্-আফিসে গিয়ে সকালের বাস্-এ আমাদের টিকিট রিজার্ভ করে এলেন। সকালে টিকিট কেটে বাস্-এ উঠতে হবে। দেরাদুনের ডাক্তার সোমের মারফত বাস্-কোম্পানির কাছে চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। সেই চিঠির দৌলতে রিজার্ভেশন পেতে কোন জায়গাতেই আমাদের বেগ পেতে হয় নাই, দেরিও করতে হয় নাই।

রাত্রে শোওয়ার অসুবিধা। ঘরে মেয়েদেরও সকলের জায়গা হল না। দুজনকে বাইরে আসতে হল। অথচ বাইরেও জায়গা নাই। একদল পাঞ্জাবী যাত্রী আমাদের সামনেকার বারান্দার সমস্ত জায়গাটাই জুড়ে রয়েছেন। কর্তা-গিন্নি প্রাচীন, লোকও ভাল। তাঁরা দুজন একটু সঙ্কুচিত হয়ে মেয়েদের দুই জনের জায়গা ক'রে দিলেন, কিন্তু তাঁদের সহযাত্রিণী এক বৃদ্ধা মস্ত বড় কম্বল বিছিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলেন। তাঁর বিছানার দুই পাশে অল্প অল্প জায়গা। সমস্তটা মিলিয়ে দুই জনের শোওয়ার জায়গা বেশ হয়। বুড়ি প্রথমে কানেই শুনতে পেলেন না। শেষে যখন তাঁকে সমেত বিছানাটা টেনে সরাবার জোগাড় করলাম, তখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গল। আমাদের আরও দু জনের জায়গা হল। সুধীরবাবু আর চা-সাহেব বিছানা বগলে করে নিচে ধরমশালার বাঁধানো চাতালে উন্মুক্ত আকাশের নিচে শুতে গেলেন। সেখানে অত বড় ধরমশালার বিস্তৃত অঙ্গনে বিস্তর লোক ভিড় করে শুয়ে আছে। ধরমশালার দোতলা বাড়িটা মাটির, কিন্তু তার উঠোনটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। আমারও সেখানে শোবার খুব লোভ হল, কিন্তু সাহস পেলাম না।

৯ মে তারিখে ভোর-ভোর হাত মুখ ধুয়ে মালপত্র নিয়ে বাস্-দাঁড়াবার জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম। ধরমশালা থেকে বাস্-এর জায়গা বেশি দূর নয়। বাস্-আফিসের সামনে তখন সারবন্দি লোক জমা হয়ে গেছে। যাত্রী অনেক। বাস্ তার তুলনায় কম। আমাদের এবার রুদ্রপ্রয়াগ যেতে হবে। শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ কুড়ি মাইল। বাস্-এর ভাড়া সামনের দিকে দু টাকা চার আনা আর পেছনের দিকে এক টাকা পনেরো আনা। টিকিটকাটা, ঠিক নম্বরের বাস্-এ গিয়ে মালপত্র ওঠানো, বাস্-ছাড়া, সবে মিলে বেশ কিছু দেরি হল। ইতিমধ্যে এক মুচি পেয়ে প্রেমলতার চপ্পলটা মেরামত করে নেওয়া হল। আমাদের সকলের ফিতে-বাঁধা কাপড়ের জুতো। প্রেমলতার ছিল কাবুলি জুতো। সেটাতে কি অসুবিধে হওয়ায় চপ্পল পায়ে দিয়ে হাঁটছিলেন। শ্রীনগরে আসার মাঝপথে চপ্পলের চামড়ার ফিতে হঠাৎ খসে এল। সঙ্গে পেরেক নাই, হাতুড়ি নাই। শ্রমিক-ভাইরা সবাই পেছনে দূরে পড়ে রয়েছে। কি করা যায়! সুধীরবাবু ও সুশীলা অনেক ধস্তাধস্তি করে কাজ চালাবার মত ব্যবস্থা একটা করে দিলে। কাজেই চপ্পল মেরামত করতে পেরে খুব স্বস্তি বোধ হল। জলখাবারের জন্য একটু রুটি বিস্কুটের চেষ্টা করা গেল। কোথাও পাওয়া গেল না।

এবার অলকনন্দাকে বাঁয়ে রেখে আমাদের বাস্ চলল। ডান দিকে পাহাড়। আবার সেই পার্বত্য পথ, উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা। এ রাস্তাটা যেন আরও খারাপ। বাস্-এর ঝাঁকানি বেশি। তবে বাঁকের সংখ্যা একটু কম। প্রায় মাইল দুই সমতল রাস্তা চলল। তার পরেই নদী সরু হয়ে এল। শ্রীনগরের আশপাশের লোকেদের ঘরবাড়ি, আবাদী জমি, সযত্নবর্ধিত গাছপালা হয়ে এল বিরল। পাহাড়ের গায়ে লতাগুল্ম, ঝোপঝাড় কম, ছোটবড় অচেনা অনেক রকমের গাছ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে দুটো একটা পাইন গাছ।

মাইল দশ বারো পরে একটা চওড়া জায়গায় এসে আমাদের বাস্ থেমে গেল। এটা একটা গেট—গাড়ি পারাপারের জায়গা। পাইন বা সরল গাছের বন এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। খুব ঘন বন নয়, অনেকটা পাতলা। সোজা লম্বা গাছ মাথা উঁচু করে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। নিচে ডালপালা নাই। উপর দিকে ডালপালা, তাও পাতলা। গাছগুলি দেখতে বেশ। মনে হল যেন কেউ সার করে পুঁতে দিয়ে গেছে। জায়গাটি নির্জন। কোথাও কোন গ্রামের চিহ্ন দেখা গেল না। নদী অনেক নিচুতে। জল দেখা যায় কি যায় না। লোকে বললে নিচে জলের ধারে কালিকেশ্বরী দেবীর মন্দির। সেখানে মাঝে মাঝে সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে ধ্যান-ধারণা করেন। রাস্তার একটু বাঁক ঘুরে মন্দিরটি দেখতে পেলাম। আমাদের ওখান থেকে অনেক নিচুতে ঠিক জলের যেন গায়ে লাগা ছোট্ট সুন্দর মন্দিরটি ছবির মত দেখতে। মন্দিরের অঙ্গনটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই মনে হল। নিচে জল, উপরে পাহাড়, চার দিকে অটুট শান্ত নীরবতা, ধ্যান-ধারণার যোগ্য স্থানই বটে। নিকটে গ্রামের লোকের তৈরি নিতান্ত সাধারণ একটি ঝোলা-পুল। ওপারের কোন গ্রামের লোকেরা বোধ হয় ওই পুল বেয়ে এসে দেবীর পূজো দিয়ে যায়। মন্দিরটি দেখে আসার বড়ই ইচ্ছা হল, কিন্তু বাস্-ওয়ালারা সময় দিতে রাজি হল না। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টায় রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে গেলাম।

রুদ্রপ্রয়াগ

বাস্ থেকে নেমে দেখি লাঠির মাথায় পুঁটলি ঘাড়ে নিয়ে বুদ্ধিরাম দাঁড়িয়ে আছে। রুদ্রপ্রয়াগের কাছেই বাড়ি। ব্রাহ্মণ, দেরাদুনে প্রেমলতাদের বাড়িতে অনেক দিন কাজ করেছে। অনেক দিনের পুরোনো বিশ্বাসী লোক। বুদ্ধিরাম নামটা প্রেমলতাদেরই দেওয়া। এই নামটা এত চল যে তার আসল নামটা এর চাপে পড়ে হারিয়ে গেছে। জানাশোনা পুরোনো লোক, আর এ অঞ্চলের অধিবাসী বলে তাকে লিখে দেওয়া হয়েছিল আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য। বেচারা দুই দিন হল তার মাইজীর জন্য এখানে অপেক্ষা করে আছে। রুদ্রপ্রয়াগে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম। এখান থেকে সঙ্গমের জায়গা দেখা গেল না। ঝোলা-পুলের উপর দিয়ে অলকনন্দা পার হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ শহরে ঢুকলাম। কালি কমলি-ওয়ালার ধরমশালায় খুব ভিড়। বুদ্ধিরাম আমাদের রুদ্রনাথজীর মন্দিরের ধর্মশালায় নিয়ে গিয়ে ওঠালে। দোতলায় দুটো ছোট ছোট ঘর। অনেকগুলো জানলা। খুব খোলামেলা। প্রচুর আলো-বাতাস। আর একেবারে সঙ্গমের উপরে। জানলা দিয়ে দেখা যায়, অনেক নিচুতে দুই নদী এক হয়ে কেমন বিপুল গর্জনে ছুটে চলেছে। বেশ জায়গা। খুব ভাল লাগল। ঠিক করা গেল এখানে এক দিন বিশ্রাম নেওয়া হবে। কাপড়-চোপড়ও কিছু পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে।

বুদ্ধিরামের উপর রান্নার ভার দিয়ে মেয়েরা সব সঙ্গমে স্নান করতে গেলেন। স্নান সেরে এক এক ঘটি জল নিয়ে সবাই উপরে রুদ্রনাথ শিবের মন্দিরে পূজো দিতে চলে গেলেন। আমরা চা-সাহেবকে নিয়ে সঙ্গমে গেলাম। অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে সঙ্গমে নামতে হয়। সঙ্গমের সোজাসুজি আমাদের মাথার উপরে

রুদ্রনাথজীর মন্দির। রুদ্রনাথজীর মন্দিরে যেতে হলে ধরমশালা থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে পাহাড়ের উপরে উঠতে হয়। সঙ্গমে যেতে হলে তেমনই নিচে নামতে হয়। অর্ধপথ নেমে সিঁড়ির গায়েই কালিকা দেবীর মন্দির। হালে তৈরি হয়েছে। আর খানিকটা নেমেই সঙ্গম।

বাপ! জলের কি গর্জন আর বেগ। অলকনন্দা আর মন্দাকিনী দুই খরস্রোতা পার্বত্য নদী অনেক উপর থেকে বয়ে এসে হঠাৎ এখানে নিচু জায়গায় নেমেছে। মন্দাকিনী কেদার থেকে এসেছে। অলকনন্দা এসেছে বদরিকার নিকট থেকে। দুইএরই প্রখর গতিবেগ ও প্রচণ্ড গর্জন। দুইটি নৃত্যশীল জলধারা যেন হঠাৎ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রলয়-উল্লাসে মেতে উঠেছে। বিশ্বমাতার এই রূপ সুন্দর, অনবদ্য, ভয়ঙ্কর। তীরে দাঁড়িয়ে এঁকে নমস্কার জানানো যায়, কিন্তু এঁর কোলে একবার গিয়ে পড়লে এই ক্ষ্যাপা নদী দুইটি তাকে লোফালুফি করে ছিঁড়েখুঁড়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সত্যই এই সঙ্গম রুদ্র। এর চারদিকে ভেঙ্গে পড়া ঢেউএর মাথায় মাথায় নটরাজ মহারুদ্রের প্রলয় নাচন চলেছে অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। এই রুদ্র প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা থেকেই মাথার উপরকার শিবের নাম হয়েছে রুদ্রনাথ। রুদ্রনাথের নামে এ প্রয়াগের নামকরণ হয় নাই।

দেবপ্রয়াগে যদিও বা শেকল ধরে অল্প জলে একটুখানি নামা চলত, এখানে তাও চলল না। সিঁড়ির নিচেই প্রচণ্ড স্রোত। দুই নদী পরস্পরের গায়ে যেন আছাড় খেয়ে পড়ছে। জলে নামে কার সাধ্য। তা ছাড়া এখানকার নিষেধটাও খুব কড়া। জলে নামা হবে না। দুই দিকে দুই নদী, মাঝখানটিতে সঙ্গম। জলে না নামলে ঠিক ঠিক সঙ্গমের জায়গাটিতে স্নান করা যায় না। পুণ্যকামীদের পুণ্যার্জনে বাধা পড়ে। তা সত্ত্বেও যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

আমাদের ডান দিকে মন্দাকিনী। উঁচু সিঁড়ি বেয়ে অতি কষ্টে মন্দাকিনীর দিকে নামা গেল। সেধারে ভিতর দিকে গর্ত হয়ে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে একটা আড়াল রচনা হয়েছে। সেখানে ঢেউএর জল ঢোকে কিন্তু স্রোতের গতি নাই। সেই নিরাপদ আশ্রয়ে একটা পাথরের উপর বসে মগে করে জল ঢেলে স্নান সেরে নেওয়া গেল। কি ঠাণ্ডা জল! রোদের প্রচণ্ড তাত, অথচ অল্প জলের স্পর্শেই শরীর জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমার মগটি সর্বকর্মনিপুণ পরম উপকারী বান্ধব—রাস্তার ছোট বড় ভাল মন্দ সকল কাজই সমান অনাসক্তির সঙ্গে করে চলেছে, আর কোন কাজেই কোন ত্রুটি বা বিরক্তি নাই। স্নান সেরে বাসায় ফিরে বুদ্ধিরামের রাঁধা আতপ চালের ভাত, মুগের ডাল ও শ্রীনগর থেকে আনা আলু-কুমড়োর তরকারি খেয়ে লম্বা বিশ্রাম নেওয়া গেল। ঘরে বেশ হাওয়া। নিচে থেকে অবিশান্ত জলের কলরোল ভেসে আসছে। তার মধ্যে বিশ্রামটা নেহাত মন্দ হল না!

বৈকালে শহর দেখতে বের হলাম। রুদ্রপ্রয়াগের দক্ষিণে অলকনন্দা পূব দিক থেকে বয়ে এসেছে, আর পশ্চিমে মন্দাকিনী উত্তরদিক থেকে নেমে এসেছে। দুই নদীর মাঝখানে রুদ্রপ্রয়াগ শহর। অথচ নদীর গায়েই পাহাড় উঠে গিয়েছে। সমতল জায়গা নাই বললেই চলে। তাই নদীর তীরে কোথাও ঘরবাড়ি হতে পারে নাই। শহরটা উপর-নিচে ছড়িয়ে পড়েছে। ছোট শহর, কিন্তু দরকারী সব জিনিসই আছে। ছোট বাজার, ডাকঘর, তারঘর, ইস্কুল-কলেজ, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সকলই আছে। ঘর বাড়ি সবই ওপরে আর নিচে। নদীর পাড় দিয়ে কেবল রাস্তা, পাহাড়ের গায়ে ঝোলানো। নদীর পাড়ে অল্প একটু জায়গার মধ্যে কেবল কালি কমলিওয়ালার ধরমশালা আর ছোট ছোট কয়েকখানি চা-পকৌড়ি আর চাল-ডালের দোকান। একটা র‍্যাশনের দোকানও আছে। কেদার-বদরীর সর্বত্রই প্রায় দেখলাম যাত্রীদের জন্য কম

দামে চাল ও আটার র‍্যাশনের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু গরিব বেচারা কুলিদের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। গাড়ওয়াল জেলার অধিবাসী বলে যদি তারা বাদ পড়ত তা হলেও না হয় একটা মানে বোঝা যেত, কিন্তু এরা নেপাল সীমান্তের লোক, রোজগারও খুব কম। দিনে একজন এক সের আটা খেতে পারে। যা মজুরি পায় খেতেই তার অনেকটা খরচ হয়ে যায়। তবুও এদের জন্য কোন বিচার বিবেচনা নাই।

বেড়াতে বেরিয়ে আগে রুদ্রনাথজীর মন্দিরে গেলাম। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে হল। সেখানে স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা। তিনিই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরই চেষ্টায় ওখানে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্কুল-কলেজ হয়েছে। বুড়ো মানুষ। চোখে দেখতে পান না। আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। চা-সাহেবের পরিচয় পেয়ে খুব খুশি। আমাদের বসিয়ে অনেক আলাপ করলেন। মন্দিরের পরিচয় দিলেন। চতুষ্পাঠী ও দাতব্য কাজের জন্য সাহায্য চাইলেন। ইতিমধ্যে অন্সূয়াপ্রসাদ পুরোহিত এসে হাজির হলেন। এখানকার কলেজের অধ্যক্ষ, উত্তর প্রদেশেরই অধিবাসী। ছেলে মানুষ। সুশ্রী চেহারা। বিনয়নম্র ব্যবহার। আলাপ হল। স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বললেন। ইণ্টার-কলেজ অল্প দিন হল হয়েছে। ইনি বি. টি. পাশ। চা-সাহেব সেণ্ট্রাল ইন্স্টিটিউট্ অব্ এডুকেশনের অধ্যাপক শুনে আমাদের উপর তাঁর ভক্তি বেড়ে গেল। মানুষটি ভাল। স্বামীজীর সকল রকম জনহিতকর কাজে তিনি সাহায্য করেন। ওখানকার কাজের সাহায্যের জন্য অন্সূয়াপ্রসাদকে আমাদের বাসায় যেতে বলে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলাম।

মন্দির থেকে বেরিয়ে পোস্ট অফিস ঘুরে অলকনন্দা পার হয়ে বাস্-এর রাস্তায় বেড়াতে গেলাম। একটা দোকানে চা খেতে গিয়ে

দেখি দোকানে কতকগুলি শুকনো লৌকি, লাউ, রয়েছে। শুকনোই হোক আর টাটকাই হোক, তরকারিবিহীন দেশে লৌকি দেখে পরম আনন্দ হল। মোটর-রাস্তায় একটু বেড়িয়ে লৌকি কিনে সন্ধ্যার মুখে বাসায় ফেরা গেল।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অলকনন্দার ধারে ধারে বাস্-এর রাস্তায় চল্লিশ মাইল দূরে চমোলি। চমোলি থেকে হাঁটা-পথে বদরী যেতে হয়। আর এই রুদ্রপ্রয়াগ থেকে মন্দাকিনীর ধারে ধারে হাঁটা-পথে কেদার যাবার রাস্তা। যাত্রীদের মধ্যে যারা শুধু এক ধাম করে, অর্থাৎ কেবল বদরী যায়, তারা বাস্-এ সোজা চমোলি চলে যায় ও সেখান থেকে হেঁটে বদরী যাত্রা করে। যারা দুই ধাম করে তাদের নিয়ম হল আগে কেদার দর্শন করে তার পরে বদরীদর্শনে যাওয়া। সেইজন্য তারা আগে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে হেঁটে কেদারের পথে যাত্রা শুরু করে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদার হল আটচল্লিশ মাইল, আর মাঝপথে চব্বিশ মাইল হল নালা-চটি। কেদার-যাত্রীরা কেদার দর্শন করে নালা-চটি পর্যন্ত নেমে আসে। নালা-চটি থেকে অলকনন্দা পার হয়ে উখীমঠ হয়ে একটা রাস্তা চমোলি চলে গিয়েছে—নালা থেকে চুয়ান্ন মাইল। দুই ধামের যাত্রীরা কেদার পরিক্রমা করে ফিরে আর রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত আসে না। নালা থেকেই হাঁটা-পথে চমোলি হয়ে বদরী যায়। এই পথেই নালা থেকে চমোলির মধ্যে তুঙ্গনাথজীর মন্দির। তুঙ্গনাথ পঞ্চ কেদারের এক কেদার। কেদার-পরিক্রমা সেরে বদরী-পরিক্রমা করাই হল সাধারণ চলতি নিয়ম। এখানকার যত যাত্রী সব কেদারের পথে চলেছে। আমরাই কেবল বদরী যাবার বাসনা নিয়ে এসেছি। মনে হল আমরা যেন সৃষ্টিছাড়া লোক। অন্য সকল যাত্রীর সঙ্গে যেন কোন যোগই আমাদের নাই।

সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া সেরে একটু চিঠি লিখতে বসা গেল। ভাল জায়গা। কেরোসিন তেল পাওয়া গেছে, কাজেই আলোর

খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে[২] ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যেরূপে পুনর্গঠিত হয়েছিল, তাতে উক্ত নীতি যথাসাধ্য অনুসরণ করা হয়েছিল। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি দৃষ্টান্তে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলবে; যথা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারির খণ্ডনে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারি ও চেকোশ্লোভাকিয়া, এই তিনটি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তন; ফিনল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়েনিয়া ইত্যাদি বল্টিক দেশগুলির রাশিয়ার দাসত্ব-বন্ধন হতে মুক্তি ও পূর্ণ স্বরাজলাভ; ত্রিধা-বিভক্ত পোল্যাণ্ডের ঐক্য ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তি; রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারি, জার্মানি ও তুরস্কসাম্রাজ্যের যেসব অংশে প্রধানতঃ বিজাতির বাস ছিল সে সমস্ত স্থানকে তদ্দেশীয় রাষ্ট্রের সহিত সংযোজনা।[৩] এই নীতির প্রভাবেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ড থেকে উত্তরাংশ বিচ্ছিন্ন করে বাদবাকিকে আয়র্ল্যাণ্ড ফ্রি স্টেট (বর্তমানে আয়ার) নাম দিয়ে ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা হল।

---

২. বিজিত শত্রুদের সহিত বিভিন্ন তারিখে যথা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন জার্মানির, ১০ই সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়ার, ২৭শে নভেম্বর বুলগেরিয়ার এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জুন হাঙ্গারির ও ২০শে আগস্ট তুরস্কের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই পাঁচটি সন্ধির মিলিত আখ্যা ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের শান্তি-চুক্তি।

৩. উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যেতে পারে জার্মান সাম্রাজ্যের এলসেস-লোরেন, শ্লেসউইগের উত্তরাংশ, ও মেমেল যথাক্রমে ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ও লিথুয়েনিয়াকে অর্পণ; রুমানিয়ার সহিত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি সাম্রাজ্যের ট্র্যান-সিলভ্যানিয়া ও পূর্ব হাঙ্গারির কতক অংশ এবং রুশ-সাম্রাজ্যের বেসারাবিয়ার সংযোগসাধন; ইটালিতে ট্রিয়েস্টের অন্তর্ভুক্তি; থ্রেস তুরস্কের কাছ থেকে গ্রীসের অধিকারে হস্তান্তর; সার্ভিয়া, মণ্টেনিগ্রো ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারির শ্লাভজাতি অধ্যুষিত দক্ষিণাংশ নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্র রচনা ইত্যাদি।

উপরোক্ত নীতিটি কিন্তু ইউরোপে সর্বক্ষেত্রে এবং সমভাবে প্রযুক্ত হল না। জার্মানি থেকে ডানজিগকে স্বতন্ত্র করে, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে চির-বিচ্ছেদের বিধান দিয়ে, রুমানিয়াতে বহু ম্যাগায়ার এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে অনেক জার্মানকে রেখে স্পষ্টতঃই এই নীতির ব্যতিক্রম করা হয়েছিল। বস্তুতঃ পূর্ব ইউরোপে নবগঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও অনেক ভিন্নজাতীয় লোকের বাস ছিল। এইসব সংখ্যালঘু ভিন্নজাতীয় লোকদের স্বার্থরক্ষাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে যে কলহের উদ্ভব হয়েছিল, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

ইউরোপে যা-ও বা হল, তার সীমার বাইরে নীতিটিকে একরকম বর্জনই করা হল। তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যে সকল নূতন আরব দেশের পত্তন করা হল, যেমন সিরিয়া, লেবানন, হেজাজ (পরবর্তী নাম সৌদি আরব), প্যালেস্টাইন (পরে দুইটি দেশে বিভক্ত), মেসোপোটামিয়া (পরবর্তী নাম ইরাক), ইত্যাদি স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করেও স্বাধীনতার গৌরব অর্জন করতে পারল না। প্রথমোক্ত দুটি দেশকে ফ্রান্সের এবং অন্যগুলিকে ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন করা হল। মিশরের উপর তুরস্কের নামিক প্রভুত্ব লুপ্ত হল কিন্তু ব্রিটিশ দাসত্বের রজ্জু-বন্ধন তার ঘুচল না। ভারত ও চীনের বেলায় এই নীতি একেবারেই মানা হল না; বরং তার চূড়ান্ত ব্যভিচারের নিদর্শন প্রকট হল যখন ভারতের মুক্তি-প্রয়াসকে নিষ্পেষণ করবার জন্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীর উপর গুলিবর্ষণ করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হল, এবং জার্মানদের হস্তচ্যুত চীনের শানতুংগ প্রদেশ জাপানের হস্তে সমর্পণ করা হল। তাই স্বতঃই মনে হয় যে, যেখানে জাতিভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল, সেখানে বিজিত শত্রুর শাস্তিবিধানই ছিল মূল উদ্দেশ্য, নীতিরক্ষা নয়। নতুবা যেখানেই বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের কারও না কারও স্বার্থ জড়িত ছিল সেখানেই নীতিটি ক্ষুণ্ণ কিংবা অগ্রাহ্য হয়েছিল কেন?

যাহোক্, উইলসনের খাতিরে যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিকতার

বিস্তার অন্ততঃ আর সম্ভবপর হয় নাই। পরাজিত প্রতিপক্ষের বশ্যতা থেকে যে দেশগুলি বিজয়ী রাষ্ট্রদের কবলে এসেছিল, সেখানে তারাই পরিচালকরূপে অধিষ্ঠিত রইল বটে কিন্তু জাতি-সঙ্ঘের আমলানামাতে ন্যাসপাল রূপে (Mandatory)। আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান ছিল এই শাসন-ব্যবস্থার (Mandate system) একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই অভিনব শাসনরীতি যে সব দেশে প্রবর্তিত হল, তাদের মধ্যে যথেষ্ট স্তরভেদ ছিল। তাদের এক প্রান্তে ছিল সিরিয়া, লেবানন ইত্যাদি প্রাচীন সভ্য দেশ—স্বরাজ লাভের সম্ভাবনা ছিল যাদের আসন্ন—এবং অপর প্রান্তে নিতান্তই অনুন্নত, প্রায় প্রস্তরযুগের দেশ স্যামোয়া, নিউ-গিনি প্রভৃতি—যাদের সুদূর ভবিষ্যতেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা ছিল অনিশ্চিত। প্রথমোক্ত দেশগুলি ব্যতীত অন্যত্র মামুলী ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী ছিলেন রাষ্ট্র-নায়কদের মধ্যে অনেকেই; কিন্তু উইলসনের নির্বন্ধাতিশয্যে তা হতে পারে নি। তাদের পরস্পরের অসূয়াও তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় ছিল এবং উইলসনের লক্ষ্য পূরণের সহায়তা করেছিল।

ঔপনিবেশিকদের খাস দখলের মধ্যে নব্য শাসনবিধি বা নীতি প্রয়োগ করবার, অন্য ভাগ্য নিয়ামকদের ত কথাই নেই উইলসনের পর্যন্ত, কোন আগ্রহ বা অভিপ্রায় দেখা গেল না। জাতিসঙ্ঘের অঙ্গীকারপত্রের (covenant) ২৩(খ) উপধারা অনুসারে সদস্যগণ এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল যে তারা তাদের 'অধীনস্থ দেশের প্রজাদের উপর সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ কি হবে এবং কি ভাবেই তা সংরক্ষিত হবে, কোথায়ও তা সূচিত হয় নি। কারও কারও মতে উপধারাটি ছিল ২২শ ধারারই প্রতিরূপ মাত্র; সুতরাং এক রকম নীতি ও পদ্ধতি রক্ষণাধীন দেশের (Mandates) মত অন্যান্য পরাধীন দেশেও (Dependencies) প্রযুজ্য। এই মত

গৃহীত হওয়া দূরে থাক্, উপধারাটি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিসঙ্ঘে প্রায় অর্থহীনের মতই প্রতিপন্ন হল। তবুও রক্ষণাধীন দেশ শাসননীতির পরোক্ষ প্রভাবে ঔপনিবেশিকতার মূল যে একেবারেই শিথিল হয় নাই, এমন কথাও জোর করে বলা চলে না।

আমরা দেখতে পেলাম যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপসংহারে পরাধীন জাতির মুক্তিসমস্যার সমাধান ইউরোপেও পুরোপুরি হল না; বরং কোথায়ও কোথায়ও সমস্যাটি নূতন আকারে দেখা দিল। ইউরোপের বাইরে সমস্যাটি সম্পূর্ণ অমীমাংসিতই রয়ে গেল। সমস্যাগুলির আশু নিরসনের কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। ২২(খ) উপধারাটিতে যে আশার বীজ বপন করা হয়েছিল, তা-ও অঙ্কুরিত হতে পারল না। তবুও 'তা হয়নি মিছে', এ সত্যটি আমরা পরবর্তী আলোচনায় বুঝতে পারব। বস্তুতঃ ম্যাণ্ডেট-নীতির মধ্যে সমস্যা নিরসনের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। আপাততঃ যদিও তার পরিসর ছিল সঙ্কীর্ণ, তার ভবিষ্য-সম্ভাবনা ছিল বৃহৎ।

পুরাতন পরিচ্ছেদটির পূর্ণ সমাপ্তি, তারপর নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা, ইতিহাসে এমন কখনও ঘটে না। নূতন ও পুরাতন দুই-ই পাশাপাশি চলতে থাকে, ক্রমশঃ নূতন পুরাতনকে ছাপিয়ে ওঠে, তারপর এক সময়ে পুরাতনের পালা ফুরিয়ে যায়, রঙ্গমঞ্চে নূতনেরই অভিনয় চলে। জাতির মুক্তি-সংগ্রামও তেমনি ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের উপর ধীরে ধীরে যবনিকা টেনে দিচ্ছিল, এইটে আমরা অতীত ইতিহাসের অনুধাবনে প্রত্যক্ষ করলাম।

৫

রক্ষণাধীন দেশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানির অধিকারে যে যে উপনিবেশ ছিল তাদের সবকটার এবং নিকট প্রাচ্যে তুরস্কের অধীন দেশগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যুদ্ধাবসানে জাতিসঙ্ঘের প্রতিভূরূপে বিজয়ী রাষ্ট্রদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, এ কথা পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। রক্ষণাধীন দেশগুলির নাম, তাদের আয়তন, এবং তাদের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলিরও নাম নীচের তালিকায় দেওয়া হল। সবে মিলে দেশগুলির বিস্তার ছিল ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং লোকসংখ্যা ছিল দুই কোটির মতন।

ক্রমিক নম্বর	রক্ষণাধীন দেশ (Mandate)	আয়তন (বর্গ কিমি.)	ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র (Mandatory)
১।	ট্যাঙ্গানিকা	৯৩২,৩৬৪	গ্রেট ব্রিটেন
২।	ক্যামেরুন	৮৮,২৬৬	
৩।	টোগোল্যাণ্ড	৩৩,৭৭২	
৪।	প্যালেস্টাইন	২৭,০০৯	
৫।	ট্রান্স-জর্ডান	৮৮,৯৬০	
৬।	ইরাক	২৯৭,০০০	
৭।	ক্যামেরুন	৪২৯,৭৫০	ফ্রান্স
৮।	টোগোল্যাণ্ড	৫২,০০০	
৯।	সিরিয়া ও লেবানন	১৭০,৭০৬ (১৬২,০০০+৮,৭০৬)	
১০।	রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি	৫৩,২০০	বেলজিয়াম
১১।	দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	৮২২,৯০৯	দক্ষিণ আফ্রিকা
১২।	নিউগিনি	২৪০,৮৬৪	অস্ট্রেলিয়া
১৩।	পশ্চিম স্যামোয়া	২,৯৩৪	নিউজিল্যাণ্ড
১৪।	নারু	২৯.২৯	ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পক্ষে অস্ট্রেলিয়া
১৫।	ক্যারলিন, মেরিয়ানা ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ	২,১৪৯	জাপান

রক্ষণাধীন দেশের শাসন ও পরিচালনা বিধি জাতিসঙ্ঘের অঙ্গীকারপত্রের ২২শ ধারায় নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

(১) যুদ্ধজয়ের ফলে শত্রুরাষ্ট্রের শৃঙ্খলমুক্ত দেশগুলির মধ্যে যাদের অধিবাসীরা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম, তাদের হিতসাধন ও উন্নয়ন সভ্যজগতের পবিত্র দায়িত্ব।

(২) উদ্দেশ্যটি কার্যকরী করবার সবচেয়ে প্রশস্ত উপায় হচ্ছে অগ্রসর জাতিদের মধ্যে যারা এই দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক এবং যাদের সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা বা ভৌগোলিক অবস্থানও তদুপযোগী, জাতিসঙ্ঘের প্রতিভূরূপে তাদের হাতেই কর্তব্যভারটি অর্পণ করা।

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা এক ছাঁচের না হয়ে, দেশগুলির স্থিতিস্থান, আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা এবং অধিবাসীদের সভ্যতা ও প্রগতির মাত্রা প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

(৪) তুরস্কের অধিকারচ্যুত জাতিগুলি এত উন্নত ও অগ্রসর যে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা একরকম স্বীকার করে নেওয়াই চলে। তবুও আপাততঃ অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না তারা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয় ততদিন তাদের পক্ষে তাদের মনোমত কোন অভিভাবকের সাহায্য ও সুপরামর্শের প্রয়োজন আছে।

(৫) অন্যান্য দাসত্ব-মুক্ত জাতিগুলি, বিশেষতঃ মধ্যআফ্রিকার অধিবাসিগণ, এখনও এমন নিম্নস্তরে রয়েছে যে তাদের শাসন-সংরক্ষণের জন্য অভিভাবক নিয়োগ অপরিহার্য।

অভিভাবকদের কর্তব্য সম্পাদনের রীতি হবে—প্রথমতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন না করে এবং নৈতিক ভিত্তি শিথিল না করে জনসাধারণের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা বজায় রাখা; দ্বিতীয়তঃ দাস, অস্ত্র ও মদের ব্যবসায় সর্বত্র রদ করা; তৃতীয়তঃ কোথাও দুর্গ নির্মাণ বা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন না করা; চতুর্থতঃ দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে লোকেদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করা;

এবং পরিশেষে জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্যকেই ব্যবসাবাণিজ্যে সমান সুযোগ ও অধিকার দেওয়া।

(৬) গোটাকয়েক এমন দেশও শত্রুশক্তির কবলমুক্ত হয়েছে, যথা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের একাধিক দ্বীপপুঞ্জ, যেগুলিকে তাদের স্বস্ব অভিভাবক-দেশের অন্তর্ভুক্ত করে তারই আইনকানুন অনুযায়ী পরিচালনা করাই প্রশাসনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কেননা দেশগুলি হয় জনবিরল নয়ত স্বল্পপরিসর, কখনও সভ্যতার কেন্দ্র হতে দূরে কখনও বা অভিভাবক-দেশটির সন্নিকটে অবস্থিত। শাসন-ব্যবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও সর্বক্ষেত্রেই পূর্বের অণুচ্ছেদে বর্ণিত শাসন-নীতিই অবশ্য পালনীয়।

(৭) প্রত্যেক ন্যাসরক্ষককেই নিজ নিজ রক্ষণাধীন দেশ সম্বন্ধে জাতিসঙ্ঘের সংসদের নিকট বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৮) কোন দেশে কি পরিমাণ কর্তৃত্ব এবং শাসন ও দমনের অধিকার ন্যাসরক্ষকদের হাতে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করে দেবে সঙ্ঘের পরিষদ।

(৯) পূর্বোল্লিখিত বার্ষিক রিপোর্টগুলি গ্রহণ করা ও পরীক্ষা করে দেখা এবং রক্ষণাধীন দেশ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে পরিষদকে উপদেশ দেওয়া, এই উভয় উদ্দেশ্যেই একটি স্থায়ী কমিশন নিয়োগ করা হবে।

ধারাটিতে শুধু মূলনীতিই সন্নিবেশিত হয়েছে। কোন দেশ, কার অভিভাবকত্বে, এবং কি শর্তে রক্ষণাধীন করা হবে তা ঠিক করা এবং তা নিয়ে দফাওয়ারি চুক্তি সম্পাদন করার ভার ছিল মিত্রশক্তির উপর। প্রতিটি দেশের জন্য স্বতন্ত্র চুক্তিনামা নিষ্পন্ন হয়েছিল। তাদের শর্তগুলি হুবহু একরকমের না হলেও সর্ববিষয়ে মূল ধারারই অনুবর্তী। মোটামুটি ক, খ ও গ এই তিন শ্রেণীতে তারা বিভক্ত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ইতরবিশেষ যা ছিল,

তার আলোচনা বাহুল্যবোধে বাদ দেওয়া হল। স্বাক্ষরিত চুক্তি-নামাগুলি ছিল জাতিসঙ্ঘের সমর্থনসাপেক্ষ।

উইলসনের প্রথম চৌদ্দ দফা প্রস্তাবে অধীন দেশ শাসনের এই নয়া বন্দোবস্তের কোন নকশা ছিল না। অল্পকাল পরেই তাঁর একটি উক্তিতে আমরা এইটের প্রথম হদিস পাই। আর তাঁরই আগ্রহে ও নেতৃত্বে ব্যবস্থাটি প্যারিসের শান্তিবৈঠকে অনুমোদন লাভ করে। তথাপি একে শুধু তাঁরই উদ্ভাবনা ও কীর্তি, এমন মনে করলে মস্ত ভুল করা হবে। যুদ্ধ শেষ হবার আগে থেকেই ইংলণ্ডে সরকারী নথিপত্রের মন্তব্যের মধ্যে এবং সর্বত্র বে-সরকারী আলোচনায় ভাবটি গর্ভকোষে ভ্রূণের মত ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছিল। বস্তুতঃ এর বীজ ছিল আরও সুদূর অতীতে নিহিত।

পরদেশ-শাসন ব্যক্তিগত বা জাতীয় ব্যবসাদারী ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়, পরন্তু প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলবিধানের পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনেরই একটি সুযোগ—ষোড়শ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমসাময়িক স্পেনদেশীয় রাজনীতিবিদ্‌দের কারও কারও লেখায় এই মতের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। আঠার শতকের মাঝামাঝি ব্রিটেনে কোন কোন সরকারী ইস্তাহারে ও পার্লামেন্টের বিতর্কে এই আদর্শ নীতিগতভাবে সমর্থন লাভ করে এবং বার্ক প্রভৃতি মানবদরদীদের অক্লান্ত প্রচারে ও গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিকাশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন-পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটাতে আরম্ভ করে। ক্রমে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দানই তাদের শাসনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্যানাডা ও অন্যান্য শ্বেত উপনিবেশ-গুলির নির্ঝঞ্ঝাটে স্বাধীনতা পাওয়ার মধ্যে আমরা এর সাক্ষ্য পাই। এশিয়া, এমন কি আফ্রিকার অশ্বেত জাতিসমূহের সম্বন্ধেও আদর্শটির প্রযুজ্যতা উনিশ শতকেই স্বীকৃত হয়েছিল; কিন্তু কার্যতঃ অনুসৃত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেত উপনিবেশগুলির সমীকরণের প্রয়াসের মধ্যে উন্নত আদর্শই ব্যঞ্জিত হয়েছিল এবং

অন্য জাতিদের শাসনেও নিছক সঙ্কীর্ণ সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে পূর্বোক্ত আদর্শবাদেরও প্রভাব ছিল। কিন্তু ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের তখনও এবং আরও অনেক দিন পর্যন্ত চৈতন্যোদয় হয় নাই।

গণতান্ত্রিক ও মানবতান্ত্রিক ভাববাদের ধারাই পরিপুষ্ট হয়ে পরম্পরাক্রমে রক্ষণাধীন দেশের পরিকল্পনায় ও গঠনে পর্যবসিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অপরদিকে এ-কথাও অস্বীকার্য যে পরিণতিটি যদি কেবল ভাববাদ প্রণোদিত ও প্রসূত হত তাহলে নিশ্চয়ই নির্বিশেষে সকল অধীন দেশেই তার প্রয়োগ হত। এই ধরনের ব্যাপক প্রস্তাব যে কোথায়ও কোথায়ও একেবারে না হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু প্যারিসের শান্তিবৈঠকে তার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ আদর্শবাদের প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আর একটি অধিকতর প্রবল কিন্তু নিতান্তই অসদৃশ প্রবাহ যার মূল উৎস ছিল কূটনীতির গহ্বরে লুক্কায়িত। অধিকার বা প্রভাব বিস্তার নিয়ে জাতিতে জাতিতে সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হলে, প্রভুত্ব বা স্বার্থের এলাকা (spheres of interest) নির্দেশ, আশ্রিত রাজ্য (Protectorate) গঠন, যুগ্ম-শাসন প্রবর্তন ইত্যাদি নানা ফিকিরে সামঞ্জস্যবিধান ও মীমাংসার চেষ্টা উনিশ শতকের ইতিহাসে বিরল নয়। এই বিবিধ কৌশলগুলিই যেন ধাপে ধাপে উঠে পরবর্তীকালে রক্ষণাধীন-রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ মৈত্রী, জোট, আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে অধীন দেশের রাজনীতিক ও অন্যবিধ সমস্যা সমাধানের সমষ্টিগত উদ্যম এই নূতন শাসনপ্রণালীর পথই প্রস্তুত করে আসছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে আফ্রিকা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তে ম্যাণ্ডেট-নীতির পূর্বাভাস স্পষ্টই লক্ষিত হয়। প্যারিসে শান্তিসভার অধিবেশনে লয়েড জর্জ যথার্থই বলেছিলেন, 'There was no large difference between the manda-

tory principle and the principle laid down by the Berlin Conference".

বার্লিন ও প্যারিসের সিদ্ধান্ত মূলতঃ এক হলেও, উভয়ের যে পার্থক্যটুকু ছিল তার গুরুত্ব কম নয়। ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রলোভন থেকে শাসককে রক্ষা করবার দুটি কবচ ম্যাণ্ডেটে ছিল—একটি বিশ্বের দরবারে জবাবদিহির দায়িত্ব আর একটি আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান। বার্লিন সিদ্ধান্তে এরূপ কোন রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা ছিল না বলেই তার নির্দেশ কখনও যথাযথভাবে পালিত হয় নাই। তখনকার পরিস্থিতিতে এতাদৃশ ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় আদৌ ছিল না। কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশই তার নিজের এখতিয়ারের মধ্যে অপরের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ব বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। যে দেশগুলি শত্রুশক্তিদের শাসনে ছিল এবং যুদ্ধের সময়ে তাদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, শান্তিস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত সেগুলির ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। তাদের বেলাতেই নব্যনীতির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ জাতিসঙ্ঘ বা অনুরূপ কোন সংস্থা গঠনের পূর্বে জবাবদিহি নেবার বা তদারক করবার ভার আর কারও উপর দেওয়ার প্রশ্ন ছিল একান্ত অবাস্তব।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হল যে, রক্ষণাধীন রাষ্ট্র-সৃষ্টি আপাতদৃষ্টিতে যতটা আকস্মিক ও অভিনব বলে মনে হয়, আসলে তা নয়। অনেকদিন থেকে আস্তে আস্তে তার প্রতিচিত্র তৈরি হয়েছিল। শুধু প্রয়োগক্ষেত্র ও দায়িত্ব নির্বাহের যোগ্য পাত্রের অভাবে তা কাজে পরিণত হতে পারে নি। শাসকের একাধিপত্য ও যদৃচ্ছা শাসনের অধিকার লোপ, শাসনের মূলনীতির নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, শাসনব্যবস্থাকে চুক্তির দ্বারা সবিশেষ নিরূপণ, শাসনকারীর কাজের জবাবদিহি দাবির ও তত্ত্বাবধানের অধিকার গ্রহণ, এবং শাসনাধীন দেশগুলিকে আখেরে স্বাধীনতাদানের অঙ্গীকার—এইগুলিই হচ্ছে

রক্ষণাধীন দেশশাসন-ব্যবস্থার বিশেষত্ব, যার জন্য মামুলী ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী থেকে তাকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে ফেলা হয়।

অধীন দেশে বিজিত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যে অধিকার ছিল, তা বর্তেছিল জাতিসঙ্ঘের উপর। তারই প্রতিভূরূপে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র এক বা অধিক দেশের রক্ষণ ও পরিচালনার ভার পেয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে অপরের হাতে না দিয়ে জাতিসঙ্ঘ নিজেই এই দায়িত্ব নিলে হত ভাল। অনুমানটি যুক্তি-সহ বলে মনে হয় না। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে একাধিক জাতির যুগ্ম-শাসন কখনও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, পরস্পরের মত-বৈষম্যে ও কলহ-বিবাদে অহরহ বিঘ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শাসনকার্যে নবগঠিত জাতিসঙ্ঘের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। শাসকগোষ্ঠী রাতারাতি তৈরি হয় না। বিচক্ষণ কর্মকুশল লোক হয়ত প্রয়োজনমত যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারত, কিন্তু নানা দেশ ও নানা জাতি হতে আহরণ করা বিমিশ্র শাসকসম্প্রদায় আশানুরূপ কার্যকরী হত কি না সন্দেহ। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাবে শাসনযন্ত্র বিকল হবার এমন কি ভেঙ্গে পড়ারও আশঙ্কা ছিল। অধিকন্তু দেশগুলির স্বকীয় জনবল বা অস্ত্রবল নির্ভরযোগ্য ছিল না অথচ জাতিসঙ্ঘের নিজস্বও কিছু ছিল না। সুতরাং এদের প্রতিরক্ষার জন্য অপরের ধার-করা শক্তিই তাকে সম্বল করতে হত। অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার ভাল চলে না, বিশেষতঃ অন্য ব্যক্তিটি যখন সকল সময়ে সকল অবস্থায় তার কাঁধে বন্দুক রাখতে দিতে নারাজ। সুতরাং রক্ষণাধীন দেশের পরি-চালনায় জাতিসঙ্ঘের প্রত্যক্ষ সংযোগ অসমীচীনই হত বলে মনে হয়। আবার সত্যের খাতিরে এ-কথাও বলা দরকার যে কোন কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী রাষ্ট্রের তোষণ এবং স্বার্থপূরণও ছিল এই ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্যতম, কারও কারও মতে মুখ্য কারণ।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রক্ষণাধীন দেশের বিধিব্যবস্থা শান্তিবৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরাজিত শত্রুদের সহিত সন্ধি স্থাপন, তাদের অধিকারচ্যুত দেশগুলির বিলিবন্দোবস্ত, রক্ষণাধীন দেশগুলির পৃথক্ পৃথক্ চুক্তিনামার খসড়া তৈরি ও জাতিসঙ্ঘের অনুমোদন লাভ, ম্যাণ্ডেট কমিশন গঠন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমাধা করতে যে বিলম্ব ঘটেছিল, তার ফলে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগে ব্যবস্থাটি পূরোপূরি চালু করতে পারা যায় নাই। তখন থেকে একনাগাড়ে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদ অবধি জাতি-সঙ্ঘকে এই দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল। কর্তব্য সম্পাদনের ভার ছিল পরিষদের (Council) উপর, কিন্তু তার কাজের ও নীতির সমালোচনা করবার পূর্ণ অধিকার সভাকে (Assembly) দেওয়া হয়েছিল। আলোচনার মাধ্যমে সভা পরিষদকে সদাসর্বদা কাজের নির্দেশ দিত ও কর্তব্যপালনে উৎসাহিত করত; কোন অন্যায় বা অব্যবস্থার তীব্র নিন্দাবাদ করতে কখনও বিমুখ হয় নি। এরূপ আলোচনার ফলে আসলে কাজ যে খুব এগুত এমন নয়, তবে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আলোচিত বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট হত এবং তাতে জনমত তৈরি হয়ে উঠত।

কাঠামোটির মূল খুঁটি ছিল স্থায়ী ম্যাণ্ডেট কমিশন। এরূপ একটি কমিশন নিয়োগের বিধান যে অঙ্গীকারপত্রের ২২শ ধারাতে লিপিবদ্ধ ছিল, তা আগেই বলেছি। পরিষদকে উপদেশ, পরামর্শ ও সর্ববিধ সাহায্যদানই ছিল সংস্থাটির একমাত্র কাজ। প্রথমতঃ নয় জন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের পর দশ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়েছিল।[1] সদস্যেরা সবাই ছিলেন বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিচারেই তাঁদের নির্বাচন হত। নির্বাচনের অধিকার ছিল পরিষদের। শাসক ও অশাসক দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিই যাতে সদস্যদের মধ্যে থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখা

১. ১৯২৪ খ্রীঃ থেকে একজন অতিরিক্ত সভ্যও ছিলেন।

হত। তবে সকল সময়েই শেষোক্তদের সংখ্যাধিক্য রাখতে হত। নিজের দেশের গভর্নমেণ্টের সঙ্গে যার কোনরকম প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, এমন লোককে সচরাচর সদস্যপদে মনোনীত করা হত না। নিয়োগের পর সদস্যেরা যতদিন ইচ্ছা ততদিনই নিজপদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। মৃত্যু বা পদত্যাগ ব্যতীত তাদের কাজের মেয়াদ ফুরাত না।

রক্ষণাধীন দেশ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য বৎসরের পর বৎসর জাতি-সঙ্ঘের দপ্তরে সংগৃহীত ও পুঞ্জীভূত হত। নথিপত্রের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল ন্যাসরক্ষকদের বার্ষিক রিপোর্টগুলি। রিপোর্টগুলি যাতে ঠিকমত লেখা হয়, সেজন্যে বিস্তারিত ফর্মও তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃত তথ্য আহরণের অন্য একটি উপায় ছিল স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে অথবা তাদের বিষয়ে অপরের নিকট হতে পাওয়া আবেদন ও অভিযোগপত্রগুলি। এগুলোর মারফত সাধারণ লোকদের অবস্থা বা দুরবস্থার অনেক কিছু খবরাখবর হামেশা পাওয়া যেত। কেননা তাদের পক্ষে জাতিসঙ্ঘে আরজি দাখিল বা নালিশ দায়ের করার অধিকার দেশের বা দেশের বাইরের যেকোন লোকের ছিল। লোকেরা ও তাদের দরদী বন্ধুরা সুযোগটি যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণও করে থাকত। প্রতিকার যে বিশেষ কিছু পাওয়া যেত এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু সাধারণ্যে প্রচার ও আলোচনার ফলে, ভবিষ্যতে যাতে এরূপ অভিযোগের কারণ না ঘটে সে বিষয়ে শাসনকর্তারা হুঁশিয়ার হতে বাধ্য হত। এইটুকু উপকারও একেবারে তুচ্ছ নয়।

কমিশন বসত বছরে দুবার। জুন মাসে ও নভেম্বর মাসে। আবশ্যকমত অতিরিক্ত অধিবেশনও হত। অধিবেশনে প্রতিভূ রাষ্ট্রদের পক্ষে প্রেরিত প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের সাথে স্বতন্ত্রভাবে তার পরিচালনাধীনে যে দেশ তৎসংক্রান্ত বার্ষিক বিবরণী ও দরখাস্ত-গুলি আলোচনা করা হত। প্রতিনিধিদের যদৃচ্ছ প্রশ্ন করবার

অধিকার কমিশনের মেম্বারদের ছিল। অতএব রিপোর্টে যা উহ্য বা অস্পষ্ট থাকত এবং দরখাস্তের সম্পর্কে জিজ্ঞাসার যদি কিছু থাকত সবই সওয়াল-জবাবের মারফত জেনে নেওয়া হত। সময়ে সময়ে জেরার চোটে প্রতিনিধিদের নাজেহাল করতেও কমিশন ছাড়ে নি। তাতে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কখনও হৃদ্যতা ও সমীহের অভাব ঘটে নাই।

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও গভীর বিবেচনার পর কমিশন রিপোর্ট ও দরখাস্তগুলি মন্তব্য ও সুপারিশ সহ পরিষদের কাছে পেশ করত। জবাবে ন্যাসপালদের বলবার কিছু থাকলে তাও কমিশনের কাগজ-পত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। পরিশেষে সবকিছু বিচারবিবেচনা করে পরিষদ রক্ষণাধীন দেশের সরকারকে তাদের বক্তব্য জানাত এবং যেখানে যেমন দরকার সেখানে তদনুরূপ উপদেশ-নির্দেশ দিত। নিজেরা কোন সক্রিয় সাহায্য করত না। পরিষদে ন্যাসরক্ষকদের প্রতিনিধিরাও সভ্য ছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের সমান ভোটাধিকার ছিল। অবশ্য তাঁদের বিরুদ্ধ ভোটের জোরে কখনও কোন প্রস্তাব বা সঙ্কল্প বাতিল হয় নাই। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি হত এই যে, এরূপ সম্ভাবনার আশঙ্কায় সেগুলোর খসড়া যথাসম্ভব তাঁদের পছন্দসই করে তৈরি করেই পরিষদে উপস্থিত করা হত।

রক্ষণাধীন দেশ সম্পর্কে কমিশনই যে ছিল জাতিসঙ্ঘের মূল কেন্দ্র, কার্যপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় যা আমরা পূর্বে দিয়েছি তার থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। কমিশনের নিজস্ব কোন কৃত্যক ছিল না; অর্থব্যয় করবার ক্ষমতা ছিল না; ঘটনা-স্থল পরিদর্শন বা সরজমিনে তদন্ত করবার অধিকার ছিল না। বহুবিধ বাধাবিঘ্নে তাদের চলার পথ কণ্টকিত ছিল। তাদের কাজের রীতিও অনেকটা ময়নাতদন্তের মত ছিল। কোন দেশের বার্ষিক প্রশাসনিক রিপোর্ট আলোচনা করা হত পরের বৎসরে ছয় থেকে দশ মাস পরে। অপচেষ্টা নিবারণের বা কৃত অপকর্মের আশু

প্রতিকারের সময় তখন অতীত। বস্তুতঃ অন্যায়ের প্রতিরোধ বা প্রতিবিধান কল্পে লীগের তরফে কোন সন্তোষজনক আয়োজন বা ব্যবস্থা মোটেই ছিল না।

সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব সত্ত্বেও কমিশন কর্তব্যনির্বাহে মোটামুটি সফলতা অর্জন করতে পেরেছিল, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। বিশ্বের জনমতকে জাগ্রত ও সচেতন করে তারই জোরে কাজ উদ্ধার করবার নীতি ও কৌশল তাদের জানা ছিল। তাদের কড়া নজরে শাসকগণ স্বার্থান্বেষণ, যথেচ্ছাচার, ও অন্যায় অবিচার থেকে অনেকটা বিরত ছিল।

কমিশনের বিরুদ্ধে মস্ত বড় অভিযোগ এই যে, জাপান চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে নিজের রক্ষণাধীন দেশগুলিতে অবাধে দুর্গনির্মাণ ও সমরসজ্জা করতে পেরেছিল। তাদের চোখের সামনে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়া তাদের অক্ষমতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে মনে হয়, কমিশনের চেয়ে পরিষদই এর জন্য দায়ী ছিল বেশী। কমিশন উপদেষ্টা মাত্র; কাজ করবার দায়িত্ব পরিষদের। কমিশন পরিষদকে ইঙ্গিতে ইসারায় সবই জানিয়েছিল; কিন্তু পরিষদ ছিল উদাসীন। আর পরিষদের সত্যিই বা করবার কি ছিল? যে স্থলে জাপানের মাঞ্চুকো আক্রমণ ও দখল বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই, সেখানে এই-সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে হম্বিতম্বি করার মানেই বা কি হত আর মুখই বা কোথায় ছিল? তারপর আমাদের মনে রাখতে হবে যে জাপান বরাবরই সত্যটিকে গোপন করে এসেছিল। কোন উন্নত সভ্য গভর্নমেণ্ট যে আগাগোড়া এমন ডাহামিথ্যা কথা বলে যেতে পারে, কেউ তা সহজে ধারণা করতে পারে নাই। জাপানে গণতন্ত্রের শিকড় শক্ত ছিল না। সুতরাং সেখানে নিজের দেশের লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলাও সরকারের পক্ষে কঠিন হয় নাই। অপরদিকে পরিদর্শনের ক্ষমতার অভাবে হাতেনাতে ধরে ফেলবার

উপায় কমিশনের ছিল না। ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও জড়িত ছিল। কিন্তু যে দেশ জাতিসঙ্ঘের আওতার বাইরে তাকে সতর্ক করবার দায়িত্ব ত কমিশনের ছিলই না, কোন রাস্তাও ছিল না। জাপানের কারচুপি ও মতলব সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিজেও ছিল অনবহিত এবং সেজন্যই ফন্দিবাজির সুযোগ ও উৎসাহ তার আরও বেড়ে গিয়েছিল। অতএব সব দিক ভাল করে বিবেচনা করে দেখলে কমিশনকে কর্তব্যচ্যুতির জন্য মোটেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

কর্তব্যপালনে কমিশন যথাবিহিত কৃতকার্য হয়েছিল কিনা তা নিয়ে মতভেদ যেমনই থাক না কেন, একথা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যেতে পারে যে কৃতকার্যে বেশীই হৌক আর কমই হৌক যা ফল পাওয়া গিয়েছিল তা সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ সদস্যদের নিরপেক্ষতা ও আত্মসংযমের গুণে। আবার মুখ্যতঃ কমিশনের গঠনপ্রণালীর বিচক্ষণতার জন্যেই এরূপ গুণসম্পন্ন সদস্যের নিয়োগ সম্ভবপর ছিল এবং তাঁরাও তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতে পেরেছিলেন। তাঁরা ছিলেন স্বদেশের রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কশূন্য বিশেষজ্ঞ। সময়ে সময়ে নিজ দেশের সরকারের বিপরীত বা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে তাঁরা পিছপাও হন নাই। যেহেতু ভোটের উপর তাঁদের নিয়োগ বা নিয়োগের স্থায়িত্ব নির্ভর করত না, সেজন্য কারও মুখের দিকে চেয়ে তাঁদের কাজ করবার বালাই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ বিচারের আসনে সমাসীন হয়েও দোষগুণ বিচারের চেয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের অধিকতর আগ্রহ নিয়ে সংযম ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন বলে তাঁরা কখনও শাসকবর্গের অনাস্থাভাজন হন নাই। নতুবা অনিবার্য বিরোধের ফলে জটিল সমস্যারই শুধু সৃষ্টি হত, এমন কি ব্যবস্থাটি ভেঙ্গেও পড়তে পারত।

কঠোর কর্তব্যের সম্মুখে কিন্তু কমিশন সাহস ও কৃতিত্ব দেখাতে পারে নাই। কেমন যেন একটা ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করেছে। এখানে যে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি

কথাটাকে গোরা-সাধু বলে ধরে নিলাম। পথ চলতে লোকজনেরা প্রায়ই চা-সাহেবের কথা জানতে চাইছিল। গোরা সাধু বলতেই তারা একটা কিছু বুঝে নিচ্ছিল। আমরা তাই চা-সাহেবের গোরা-সাধুর পরিচয়টাই বাহাল রাখলাম। প্রশ্নেরও জবাব হল, অনাবশ্যক বাড়তি জবাবদিহি থেকে আমরাও রেহাই পেলাম।

গোরা-সাধু, সুধীরবাবু ও আমি একসঙ্গে গল্প করতে করতে চললাম। রাস্তা বেশ চওড়া। চড়াই উতরাই বেশি নাই। মোটামুটি সমান রাস্তায় চলেছি। গতি মোটের উপর নিচু দিকে। অলকনন্দার ধারে ধারে চলেছি, কিন্তু নদী অনেক নিচুতে। কখনও দেখা যায়। কখনও যায় না। নদী বেশি নিচুতে না হলে কল-কল্লোল শোনা যায়। কখনও একদিকে পাহাড়, কখনও দুই দিকেই। সেখানে নদীর ও-পারের পাহাড় যেন এদিকে চেপে এসেছে। ও-পারের পাহাড় যেখানে দূরে সরে গিয়েছে সেখানে নদী এ পারেও খানিকটা জায়গা পেয়েছে। আমাদের বাঁয়ে নদী। রাস্তা আর নদীর মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরল গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নানা রকমের সরল গাছ, কেবল পাইন নয়। মাঝে মাঝে কাঠগোলাপের গাছে এক-সার-পাপড়ির সাদা কাঠ-গোলাপ ফুটে আছে। এক রকমের বড় গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ লম্বা লাল ফুল। একটু মেঘলা মেঘলা ভাব। মাঝে মাঝে রোদ উঠছে। মাঝে মাঝে ছায়া। সরল গাছ ও অন্যান্য বড় গাছ রাস্তার উপরে ডালপালা মেলে দিয়েছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা।

বাঁকের পর বাঁক ঘুরে চলেছি। হঠাৎ একটা বাঁক পার হতেই সামনে রজতশুভ্র হিমমণ্ডিত গিরিচূড়া দীর্ঘপ্রত্যাশিত পরমাশ্চর্যের আকস্মিক আবির্ভাবের মত অপরূপ হয়ে দেখা দিল। যাত্রীরা হর্ষ-চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেকে বললে, নারায়ণ পাহাড়ের চূড়া। ওরই কোলে বদরীনাথ শহর। দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

দেখেছি। সে তো ছবির মত। এ হল খুব স্পষ্ট এবং খুব কাছে। মনে হল অল্প কিছু দূর গেলে ওই হিমশোভার কাছে যাওয়া যাবে। বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে চলেছি। হিমচূড়াও আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চলেছে। এক বাঁকে অদৃশ্য হয়। আর এক বাঁকে সামনে এসে পড়ে। চা-সাহেবকে ছবি নিতে বললাম। বললেন, এ আলোয় ছবি নেওয়া চলবে না।

জয় বদরী বিশাল, জয় বদরী বিশাল। যাত্রীরা আসছে আর যাচ্ছে আর পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার জানাচ্ছে, ছেলেবুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, গৃহী-সন্ন্যাসী, সকলের মুখেই এক কথা। সকলেরই ঐ এক অভিবাদন। বিচিত্র এই অভিবাদনের ধারা। এর ভিতরে মানবিক সংস্পর্শ নাই, চলতি সামাজিকতা নাই, সাধারণ কুশলপ্রশ্ন নাই। মানুষের অন্তর্নিহিত মঙ্গল ইচ্ছার প্রকাশের জন্য বাইরের কোন অবলম্বনই নাই। মানুষের অন্তরের নারায়ণ অন্তর থেকে অন্তরের সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ পরিচয় করছেন। বদরী-প্রত্যাগত নারায়ণ বদরীগামী নারায়ণকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন। তাই অবলম্বনের কোন বাহুল্য নাই অথচ আত্মীয়তাতেও কোন খুঁত হয় নাই। সহজ, সরল, অনাবিল এই আত্মীয়তার যেন শেষ নাই। অনাসক্ত সহজ এই আত্মীয়তা অন্তরের স্বাভাবিক ও সাক্ষাৎ প্রকাশ।

জয় বদরী বিশাল, জয় বদরী বিশাল, দুজন বদরী-প্রত্যাগত মাঝবয়সী বাঙালী মেয়ে আলাপ করবার জন্য দাঁড়ালেন। সদ্য তীর্থদর্শনের পরিতৃপ্তি ও আনন্দ তাঁদের মুখচোখ থেকে ঝরে পড়ছে। তাঁদের সঙ্গীরা আগে পাছে রয়েছে। মাঝখানে দু-জনে চলেছেন। পথের খবর দিলেন, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, উৎসাহ দিলেন। যেন কতদিনের চেনা-জানা আপনার জন। অথচ এক মুহূর্ত আগেও জানা ছিল না, এক মুহূর্ত পরেও তাঁদের পরিচয় যেন হাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল। বোধ হয় এঁদেরই সঙ্গী,

কয়েকজন বাঙালী ছেলের সঙ্গে দেখা হল। তারা সব যেন ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। গড়গড় করে বলে গেল কেদারই কঠিন, বদরীযাত্রা সোজা, কেদারের রাস্তা ভাল, এদিকের রাস্তা ভাল নয়, আরও কত কি।

গরুড় গঙ্গা

মাইল দুই দূরে দধিগঙ্গা এসে অলকনন্দায় মিশেছে। আরও দু মাইল গেলে গরুড়-গঙ্গা। এর কাছেই গরুড়-গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম। আসল সঙ্গমের জায়গাটা খানিকটা দূরে। গরুড়-গঙ্গায় চা-জিলিপি খাওয়া ও বিশ্রাম করা হল। এখানে গরুড়-গঙ্গা নদীর কাছে নেমে এসেছে। নদীতে জল অল্প, স্রোত সামান্য। নদীর পাড়েই গরুড়জীর মন্দির। এখানে স্নান করে যাত্রীরা গরুড়জীর পূজো দেয়। নদীগর্ভ থেকে পাথরের নুড়ি সংগ্রহ করে। বিশ্বাস, এই পাথরে সাপের বিষের ওষুধ আছে। আমরা জল মাথায় দিয়ে গরুড়জীকে নমস্কার করে এগিয়ে চললাম।

তীর্থের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় সমগ্র বদরীতীর্থের তিনটি ভাগ কল্পনা করা হয়েছে। নন্দপ্রয়াগ থেকে গরুড়গঙ্গা পর্যন্ত স্থূল বদরীক্ষেত্র, গরুড়গঙ্গা থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ সূক্ষ্ম বদরীক্ষেত্র, আর বিষ্ণুপ্রয়াগের পর থেকে সূক্ষ্ম বদরীমণ্ডল।

এই বিভাগের তত্ত্বকথা আমরা ঠিক ঠিক জানি না। সম্ভবত পুরাণাদির বর্ণনা অনুসারেই এই ভাগ করা হয়েছে। মানুষের মনে তীর্থপ্রবণতা এনে দেবার জন্য তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা একটা উপায় মাত্র। তীর্থমাহাত্ম্যের মধ্যে স্থান-মাহাত্ম্যের একটা কথা আছে। স্থান-মাহাত্ম্যের কথা আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু জানা।

প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু বিশাল, যা কিছু বিরাট, যা কিছু সুন্দর বা ভয়ঙ্কর, যা কিছু অসামান্য ও অবারিত তাই আমাদের মনকে ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। সেই জন্যই অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়ার দরকার হয়।

তা ছাড়া সাধু-সন্ন্যাসী লোকেরা যেখানে দেবদর্শনে যান, ও সাধন-ভজন ধ্যানধারণা নিয়ে যেখানে জীবন কাটিয়ে দেন সে সকল জায়গার আকাশে বাতাসে তাঁদের জ্ঞান-ভক্তি, তাঁদের তপস্যার প্রভাব ছড়িয়ে থাকে। অনুকূল মন নিয়ে সেখানে গেলে সেই মনে সহজেই জ্ঞান-ভক্তির স্ফুরণ হয়; সেদিক থেকে তীর্থক্ষেত্রের বা সাধু-সন্ন্যাসী-মহাপুরুষদের তপস্যাক্ষেত্রের একটা প্রভাব বা মাহাত্ম্য অবশ্য চিরকালই থাকে।

এ ছাড়া দেবদর্শনের জন্য মনটাকে ক্রমে তৈরি করে নেবার একটা চেষ্টাও বোধ হয় এই মাহাত্ম্য-বর্ণনার মধ্যে আছে। এ দেশে দীর্ঘকাল ধরে তীর্থপর্যটনের যে রীতি চলে এসেছে তার মূল কথাও হল মনটাকে তৈরি করে নেওয়া। ছোট থেকে বড়, বড় থেকে আরও বড়, অভ্যাসের বাঁধা রাস্তা থেকে বন্ধনহীনতার অবারিত উন্মুক্ততার দিকে মনটাকে তৈরি করে নেওয়া।

আমাদের ধর্মজীবনের লক্ষ্যও সমাজবিধির অন্তর্গত। তাই দীর্ঘকাল ধরে সংসারধর্ম পালন করে শেষ বয়সে সব কিছু ফেলে রেখে অনিশ্চয়ের পথে পা বাড়ানোর এই ব্যবস্থা। মানুষ নিজের অন্তরে ও বিশ্বের অন্তরে যে দেবদর্শন করতে চেয়েছে মনের এই বন্ধনমুক্তি বা বৈরাগ্য তারই উপায়। এই দেবদর্শনের জন্যই মনের এই তৈরি হওয়া।

বদরীযাত্রার এই তিনটি ধাপনির্দেশও বোধ হয় সেই রকম— আসল দেবদর্শনের জন্য মনটাকে ধাপে ধাপে তৈরি করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রনির্দেশের অন্তর্নিহিত অর্থ বোধ হয় এই যে মনে শেষ পর্যন্ত যে সকল পিছটান থেকে যায় তাও এক এক ক্ষেত্রে বিসর্জন দিতে

দিতে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ, শান্ত, অনাসক্ত চিত্তে দেবদর্শনে অগ্রসর হতে হবে।

সে দেবতা বিশ্বের। তিনি বিশ্বের অতীত লোকের। অথচ তাঁকে প্রথম উপলব্ধি করতে হয় গর্ভগৃহে। তাঁকে প্রথম দেখতে হয় অন্তরের মণিকোঠায়। অন্তরের অন্তরতম লোকে তাঁর স্থান। বদরীনারায়ণও অন্তরতম। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর গ্রামে মনকে না বাঁধতে পারলে তাঁর দর্শন হয় না। তার জন্য মনকে তৈরি করতে হয়, তারই বাইরের প্রকাশ এই ক্ষেত্রবিভাগের মধ্যে করা হয়ে থাকবে।

পাতাল গঙ্গা

গরুড়-গঙ্গা থেকে দু মাইল চড়াই করে টঙনি। টঙনি থেকে দু মাইল উতরাই করে পাতাল-গঙ্গায় নেমে এলাম। পাতাল-গঙ্গাই বটে। উঁচু দিয়ে যতক্ষণ চলছিলাম, নদী যে বরাবর পাশেই রয়েছে সে কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। না দেখা যাচ্ছিল তার জল, না ছিল তার কলকল্লোল। ওপারের পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে জলধারা নেমে এসেছে দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় যে পড়েছে তা আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। এখানে অলকনন্দা একটু দূরে সরে গিয়েছে। আমরা একেবারে পাতাল-গঙ্গা বা গণেশ-গঙ্গার গায়ে নেমে এসেছি। দুই নদীর সঙ্গম এখান থেকে দেখা যায় না। এ যেন পাতালেই নেমে এসেছি।

লোকে বলে পতনের পথ খুব সহজ, কিন্তু রাস্তাটি এখানকার মোটেই সুগম নয়। পথে গুটিকয়েক নরম পাথরের পাহাড়। তারই গা দিয়ে রাস্তা। কখনও কখনও রাস্তা ধসে পড়ে। একটু বৃষ্টি হলে উপর থেকে পাথর পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন

সোজা পাহাড় ডিঙ্গোনো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। টঙনি থেকে অনেকটা নেমে দেখতে পেলাম সামনে রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত এক পাশ থেকে ধসে পড়েছে। যেটুকু রাস্তা আছে সেটুকু এত সরু যে একজন লোক কোনরকমে সে রাস্তায় চলতে পারে। ছ-ফুট চওড়া রাস্তার তিন ফুটই ভেঙ্গে পড়েছে। যে দিকটা ভেঙ্গেছে সে দিকটায় বরাবর দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট পাথর ও ঝুরো মাটির আলগা স্তূপ। মনে হল, যে ধার দিয়ে চলতে হবে লোকের ভার পেলে সে ধারও বা কখন খসে পড়ে। আর যদি একবার খসে তা হলে গড়াতে গড়াতে কোন অতলে যে যেতে হবে সে পর্যন্ত আমাদের নজর চলছে না। প্রাণটা হাতে করে বদরী বিশাল জপ করতে করতে কোন রকমে রাস্তাটা পার হয়ে গেলাম। পার হলাম বটে কিন্তু ভাবতে লাগলাম আমাদের শ্রমিক-ভাইরা বিছানাপত্র মোটমাটরি নিয়ে কি করে এই রাস্তা পার হবে। একটা জায়গা খুব সরু হয়ে এমন একটা কোণের সৃষ্টি হয়েছে যে মোড় ঘুরতে খালি হাত-পায়ে একটা লোককেও রীতিমত বেগ পেতে হয়। মালপত্র নিয়ে মুটেদের কি শেষ পর্যন্ত একটা দুর্ঘটনা ঘটবে ?

চটিতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন মনে হল, নাঃ, এ যাত্রা তো রক্ষা পেয়ে গেলাম, ফিরতি পথে আর একবার এই সঙ্কট পার হতে হবে। তবুও মুটেদের জন্য দুশ্চিন্তাটা গেল না। অনেক বেলায় যখন তারা একে একে এসে হাজির হল তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

এখানেই দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারা হবে ঠিক হল। বুদ্ধিরাম রান্নার জোগাড়ে লেগে গেল। ছোট জায়গা। অল্প কয়েকখানি চটি। নদীর একেবারে গায়েই চটি। জলের জন্য বেশি নিচে নামতে হয় না। ঝরনা নাই। পটাশ পারমাঙ্গানেট দিয়ে নদীর জলই ব্যবহার করতে হল। নদীতে জল গভীর নয়। নদীগর্ভে

জলের চাইতে পাথরই বেশি। পাথর টপকে ভিতরে যেখানে সেখানে যাওয়া যায়। নদীতে জল কম বটে কিন্তু স্রোতের বেগ বেশ। পাথরে বিভক্ত হওয়ায় অনেকগুলো ধারার সৃষ্টি হয়েছে। নদীর উপরে, নিচে, কিনারায়, মাঝখানে, যার যেখানে খুশি যাত্রীরা স্নান করছে।

নদীর ওপরে রাস্তার ধারে গণেশজীর ছোট মন্দির। গণেশ-গঙ্গা বা পাতালগঙ্গা একটু দূরে গিয়ে অলকনন্দায় পড়েছে। রাস্তা থেকে সঙ্গম-স্থান দেখা যায় না। কয়েকখানি গমভাঙ্গা পানচাক্কি বা জাঁতা আছে। কিছু উপর থেকে সরু খাল কেটে লোকেরা নদীর জল নিয়ে এসেছে। এখানে একটু উঁচু থেকে সেই খালের জল নদীগর্ভে ছেড়ে দিচ্ছে। জল যেখানে নদীতে পড়ছে তার মুখে একটা দাঁতওয়ালা চাকা বসানো। সেই চাকার সঙ্গে জাঁতার হাতলের যোগ। জল বেগে নিচে পড়ার সময়ে চাকার দাঁতে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার চোটে একটা দাঁত নিচে চলে যায়, আর একটা দাঁত জলের মুখে এসে পড়ে। দাঁতগুলির একটার পর একটায় ক্রমাগত এই রকম ধাক্কা লেগে চাকা বন বন করে ঘুরতে থাকে। চাকার ঠেলায় জাঁতার হাতলে ধাক্কা লাগে ও জাঁতাও দ্রুতবেগে চলতে থাকে। জাঁতার উপরে রাখা একটা টিনের চোঙ-এর সরু মুখ দিয়ে অল্প অল্প করে গম জাঁতায় পড়তে থাকে। এই রকমে লোক বাদ দিয়েও জলের শক্তিতে আপনা-আপনি গম পেষা হতে থাকে। লোকেরা কাছেই অন্য কাজকর্ম নিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে একবার করে এসে জাঁতার কাজ তদারক করে যায়। জলের শক্তিতে চলে বলে এর নাম পানি-চাক্কি বা পান-চাক্কি। পান-চাক্কিতে ভাঙ্গা গমের আটার দাম একটু বেশি। খেতেও বেশ মিষ্টি।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে বেশ মেঘ করে এল। একটু বিশ্রাম করে বৈকালে অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যেই পথে বার হয়ে

পড়লাম। একটা ছাতার নিচে সুধীরবাবু আর আমি। পশমী চাদরটা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। পশমী চাদর থেকে সহজে জল ঝেড়ে ফেলা যায়। শুকোয়ও তাড়াতাড়ি। সামনের রাস্তা আরও অল্প কিছু দূর খারাপ। এই খারাপ রাস্তার শেষে একটা ঝরনার উপরকার নিচু কাঠের পুল ভেঙ্গে গিয়েছে। পাথর-টাথর দিয়ে কোন রকমে সাময়িক ভাবে সেটাকে একটু চলনসই করে নেওয়া হয়েছে। এক জনের পেছনে আর একজন করে এই রাস্তাটুকু পার হতে হবে। ওপারে লোকজন ও মালবাহী ভেড়ার পালকে আটক করা হয়েছে। এধার থেকে একদল লোক পার হলে তাদের ছাড়া হবে। বিপজ্জনক রাস্তায় এই রকমই ব্যবস্থা করা হয়।

কেদার-বদরী তীর্থ উত্তর প্রদেশের গাড়ওয়াল জেলার অন্তর্গত। তীর্থযাত্রার ছয় মাস এই জেলায় উত্তর-প্রদেশ-সরকারের কাজ অনেক বেড়ে যায়। রাস্তাঘাট মেরামত করা ও চালু রাখা, যাত্রীদের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা বজায় রাখা, সাময়িক ভাবে হাসপাতাল খোলা, জায়গায় জায়গায় র‍্যাশনের দোকানের ব্যবস্থা করা, এ সকলই সরকারকে করতে হয়। সকল ব্যাপারে সরকারের ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। রাস্তা মেরামত করার জন্যও একদল লোক বরাবরই মোতায়েন ছিল। পাতালগঙ্গার যে রাস্তাটা আমরা খারাপ পেলাম সেটাও দুই এক দিনের মধ্যেই মেরামত করে ফেলা হয়েছিল। ফেরার সময় আমরা এই রাস্তা অনেকটা ভাল অবস্থাতেই পেয়েছিলাম। উত্তর প্রদেশের সরকারের যখন এদিকে নজর রয়েছে তখন আশা করা যায়, উত্তরোত্তর ব্যবস্থা ক্রমে আরও ভাল হতে থাকবে।

অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছিলাম। এখন অনেকটা চড়াই আরম্ভ হল। পাহাড়ের রাস্তায় বরাবর দেখলাম চড়াই-এর পরই উতরাই-এর আরম্ভ, আর উতরাই-এর যেখানে শেষ সেখানেই

শুরু হয় চড়াই। এই জন্য উতরাই পেলে মনটা যখনই খুশি হয়ে উঠত, তখনই মনে আশঙ্কা হত এরই পরে হয় তো আবার আছে কঠিন চড়াই। পাতালগঙ্গার আগে অনেকটা উতরাই করেছি। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এল অনেকখানি চড়াই।

পারুল-বোন

মেয়েরা এগিয়ে চলেছে। তাদের আর দেখা যায় না। একমাত্র পারুল সামনে আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে রয়েছে। পেছনে আমরা পঞ্চাশোর্ধ্ব তিন জন। সুধীরবাবু, গোরা সাধু ও আমি। পারুল ছোট্টো-খাট্টো মানুষটি। খুব ধীরে চলে। ধীরে চলে বটে কিন্তু পথ-চলাতে কাতর নয়। টুক টুক করে ঠিক জায়গাতে গিয়ে পৌঁছোবে। একটু বেশি সময় নেবে এই যা। এই জন্য সকলের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। পেছনে পড়ে যায়। তার তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করতে করতে চলেছে। ধীর শান্ত স্বভাব। মনটি সাদা, ধর্মচিন্তায় তদ্গত হয়ে আছে। পেছনে একা চলে বলে আমাদের নজরটা তার ওপর পড়ে থাকে। কখনও গোরা-সাধু এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে চলেন, কখনও আমরা। পারুল ইংরেজি জানে না, হিন্দিও বলতে পারে না। তবুও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে চীনে দাদার সঙ্গে আলাপ চালায়। চা-সাহেব ওকে খুব স্নেহ করেন।

আজ পারুলের কথা বেশি করে মনে পড়ছে। ইংরেজি ১৯৫২ সালে আমরা তীর্থভ্রমণে যাই। এটা ৫৩ সাল। ভ্রমণকাহিনী লিখতে লিখতে খবর পেলাম এই সেদিন হঠাৎ মোটর-দুর্ঘটনায় পারুল দেহত্যাগ করেছে। আমাদের মধ্যে পারুলই ছিল বোধ

হয় সকলের চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ, কিংবা প্রেমলতা আর পারুল একবয়সী হবে। তীর্থের পথে আমরা এক সঙ্গেই ফিরে এসেছিলাম। জীবনের পথে স্বামী-কন্যা রেখে আমাদের আগেই সে চলে গেল।

রেণু সংসার ও কাজকর্মে ডুবে থাকতে ভালবাসে। মন্ত্র নেবার বোধ হয় এখনও সময় হয় নাই। পূজো-আহ্নিক জপতপের তার বালাই ছিল না। সুশীলা চালাক লোক। গরদের শাড়ি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় সঙ্গোপনে বিছানাতেই আহ্নিকের কাজটা সেরে নিত। পারুল আর প্রেমলতার নিষ্ঠা বেশি। কাপড়চোপড় ছেড়ে শুদ্ধাচারে তাদের আহ্নিক করতে হত। কাজেই তাদের পূজো-আহ্নিকের কথা আমরা সকলেই জেনে গিয়েছিলাম। এই নিয়ে পারুলকে অনেক টিটকারিও সহ্য করতে হয়েছে। পারুলের দাদা সুবোধ তো বরাবর তার পেছনে লেগেই থাকত। গুরু, মন্ত্র, পূজোআচ্চা সবেতেই সুবোধের ঠাট্টা। ভালমানুষ পারুলের কিন্তু তাতে কোন চিত্তবিক্ষেপ ছিল না। নির্বিকার চিত্তে সে নিজের কাজ করে যেত। কে কি বলছে তাতে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তর্কবিতর্কের মধ্যে মাঝে মাঝে আমাকে মধ্যস্থ মেনে বসত। আমি অবশ্য সকল সময় তাকেই সমর্থন করতাম। ধীর, শান্ত আত্মসমাহিত পারুলের সেই সকল প্রশ্নের কথাই এখন মনে পড়ছে। গুরুদত্ত মন্ত্র অবলম্বন করে সহজ সরল বিশ্বাসে ইষ্টদেবতার অর্চনা করে সে কি পেল আর পেল না তার কৈফিয়ত আমাদের কাছে আর তাকে দিতে হবে না, কিন্তু মহাকালের হিসাব-নিকাশে কোন অঙ্কই তার বাদ পড়বে না। সবই অক্ষয় হয়ে জমা হয়ে থাকবে।

সিংহদ্বার

দু মাইল চড়াই করে গোলাপকুঠি। গোলাপকুঠি থেকে একটু নেমে সওয়া দু মাইল দূরে কুমারকোট বা হেলঙ চটি। হেলঙ থেকে অল্প দূরে কর্মনাশা নদী এসে অলকনন্দায় পড়েছে। এখানে অনেকগুলি চটি, ধরমশালা, ডাকঘর আছে। সন্ধ্যার একটু আগে কুমারকোটে পৌঁছোনো গেল। এখানেই রাত্রিবাস। মেয়েরা রাস্তায় পুদিনা সংগ্রহ করেছিলেন। পুদিনার চাটনি দিয়ে রাত্রের ভোজনপর্ব ভালই সমাধা হল। রাত্রিতে বেশ শীত পড়ল। লেপ গায়ে দিতে হল। মোজাও বার করলাম।

১৪ই মে সকালে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে কুমারকোট থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দেড় মাইল দূরে পৈনি। পৈনিতে বৃষ্টির একটু জোর হল। সেখানে চা-টা খেয়ে একটু বসলাম। পৈনি থেকে আধ মাইল খনোটি। খনোটিতেও বৃষ্টির জন্য একটু অপেক্ষা করতে হল। এক সময়ে খনোটিতে অনেকগুলি চটি ছিল। পাহাড় পড়ে কতকগুলি চটি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই থেকে ওখানকার চটিওয়ালারা সব এদিকে ওদিকে সরে গেছে। এখন সেখানে আমরা একটিমাত্র চটি দেখতে পেলাম।

খনোটির এক মাইল পরে ঝড়কুলা। কুমারকোট থেকে অনেকটা উঁচুতে এসে উঠেছি। দুই দিকের পাহাড়ের মাঝখানে স্বল্পপরিসর একটা ফাঁক নদীর নির্দেশ করছে, কিন্তু নদীর জল আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের ডান দিকে পাহাড়। তারই গায়ে রাস্তা। রাস্তার ধারে অলকনন্দা। তার পরে ওপারের গিরিশ্রেণী। দু দিকের পাহাড় নিচের দিকে অলকনন্দাকে যেন চেপে ধরেছে। পার্বত্য নদীর গর্জনশীল নৃত্য চোখে পড়ে না,

গর্জনের আওয়াজও কানে আসে না। উপরের দিকে দুই ধারের গিরিশ্রেণীই খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। তারই গা বেয়ে মাঝে মাঝে নেমে এসেছে রৌপ্যময়ী তন্বী পার্বত্য স্রোতস্বতী। অনেক দূর পর্যন্ত সেগুলির গতিপথ নজরে পড়ছে। একই নদীর বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত রূপ। খানিকটা দেখা যায়, অনেকটা আড়ালে পড়ে থাকে। টুকরো টুকরো জলধারা দেখা যায় অথচ সমগ্র প্রবাহকে দেখা যায় না। পাহাড়ের আড়ালে চলেছে নদী-প্রবাহের লুকোচুরি খেলা।

পাহাড়ের ঢালু গায়ে দু ধারেই লোকবসতির চিহ্ন। উপরে নিচে থাকে থাকে সাজানো সার সার চাষের জমি। জমি তো নয়, জমির ফালি। কোন এক খণ্ড জমিও বেশি বড় নয়। উপর নিচে খুবই সরু, পাশের দিকে কিছুটা চওড়া। এ অঞ্চলের গরু ছোট, লাঙলও ছোট, কিন্তু বেশির ভাগ জমিতে সে লাঙলও বোধ হয় চলে না। সবই কোদালে করতে হয়। নদীর অন্য পারে দেখছি জমিগুলি মইএর মত ধাপে ধাপে নিচে থেকে ওপর দিকে উঠে গিয়েছে। এখন কোন ফসল নাই কিন্তু জমির বিন্যাসটা দেখতে বেশ লাগে। ডান দিকের গিরিশ্রেণীর দূরের পর্বতশীর্ষে বনানীর শ্যামশোভা মেঘের মত জমাট হয়ে আছে।

ঝড়কুলা থেকে দেড় মাইল সিংহধার। সিংহধার থেকে দেড় মাইল দূরে জ্যোতির্মঠ বা জোশিমঠ। ঝড়কুলার পর থেকেই রাস্তা সহজ হয়ে এল। একটা সমতলে এসে যেন পড়লাম। ক্রমে দুদিক একটু একটু করে চওড়া হতে লাগল। ডাইনে ঢাল নামিয়ে পাহাড় দূরে সরে গেল। বাঁয়ে নদী একটু সরে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দিলে। নদীর ওপরেই আমাদের রাস্তার দুদিকে চাষ আবাদ, ফলফুলের বাগান দেখা যেতে লাগল।

ডিম ডিম ডিম ডিম। দূর থেকে বাজনার আওয়াজ ভেসে এল। বাঁক পার হয়ে দেখি সিংহধারের মুখে একজন ছোট ঢাক বাজাচ্ছে। আশপাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নৃত্য করছে। যাত্রীরা যেতেই

তাদের ঘিরে দাঁড়াল। তীর্থযাত্রার সফলতা ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা করে হাত পাতলে। কিছু তাদের দিতে হল। পাহাড়ে অনেক জায়গায় দেখলাম বিশেষ বিশেষ স্থানের প্রবেশদ্বারে এই বাজনা বাজিয়ে তীর্থযাত্রীর জয় ও সফলতা কামনা করে এবং তীর্থের পরিচয় জ্ঞাপন করে পয়সা চাইবার রীতি প্রচলিত আছে। এরা একান্ত গরিব অথচ নিজেদের সরল জীবনযাত্রায় সন্তুষ্ট। বেশি কোন আকাঙ্ক্ষা আছে বলে মনে হয় না। তবুও যাত্রীদের কাছে ওদের একটা পাওনা আছে বলে ওরা মনে করে। যাত্রীরাও খুশি মনে ওদের কিছু কিছু দেয় অথচ সাধারণ ভাবে ভিক্ষাবৃত্তির প্রসার পাহাড়িদের মধ্যে দেখি নাই। স্ত্রীপুরুষে কঠিন পরিশ্রম করছে।। মেয়েরা কাঠের বোঝা, ঘাসের বোঝা, বয়ে নিয়ে চলেছে। পুরুষেরা বড় বড় কাঠ কিংবা কাঠের তক্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বেশভূষায় দৈন্যের ভাব পরিস্ফুট। মেয়েদের কম্বলের ঘাগরা পরা, কম্বলের জামা গায়ে। পরিবর্তন করার মত দ্বিতীয় পোশাক আছে কিনা সন্দেহ। মনে সন্তোষ ও মুখে হাসি লেগে আছে। সুচসুতো কি দুটো একটা পয়সা পেলে খুশি হয়, কিন্তু এগিয়ে এসে পয়সা চায় না। এত অল্পে সন্তুষ্ট লোক সমতলে আদিবাসীদের মধ্যে ছাড়া বড় একটা দেখা যায় না। সমতলের গরিবদের উৎসাহ নাই অথচ মনে সন্তোষও নাই।

সিংহধার বেশ প্রশস্ত জায়গা। ভাল ভাল চটি আছে। জলের ব্যবস্থা প্রচুর। বড় বড় ফুল ও ফলের বাগান। সবই জোশিমঠের বদরীমন্দিরের অর্থাৎ বদরীনারায়ণের পূজারী রাওলদের। বাগানে বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে। গাছে আপেল, পিচ, প্লাম, আঙুর আরও নানা রকমের ফল সবে ধরতে শুরু করেছে। সিংহধারে ঢোকার মুখেই সুই ফোটানোর আফিস ও দাওয়াইখানা। আমাদের টিকে নেবার পরচা দেখাতে হল।

জোশিমঠ

সিংহধার পার হয়ে মাইল খানেক গেলে রাস্তা তিন ভাগ হয়ে গেছে। একটা, পাহড়ের উপর দিয়ে শঙ্করাচার্যের জ্যোতির্মঠে চলে গেছে। একটা, নিচু দিয়ে সোজা বিষ্ণুপ্রয়াগ চলে গেছে। আর মূল রাস্তাটি আধ মাইল দূরে জোশিমঠ শহরে গিয়ে পোঁছেচে। পাহাড়ের উপরে জ্যোতির্মঠ, নিচে জোশিমঠ শহর। ১৪ই মে সকাল পৌনে দশটায় জোশিমঠে পোঁছোনো গেল। কালি কমলিওয়ালার ধরমশালার দোতলায় একটা ঘর ও সামনেকার বারান্দার একটা ভাগ পাওয়া গেল। ঘরে ও বারান্দায় বিছানা পেতে বেশ করে চা-জিলেপি খেয়ে মেয়েরা রান্নাবান্নার জোগাড়ে লেগে গেলেন। আমরা কিছুক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করে চিঠিপত্র লিখতে শুরু করলাম। আজ হাঁটা কম হয়েছে, কিন্তু এটা বড় জায়গা। অনেক কিছু দেখার আছে। তাই আজ এখানে থাকাই ঠিক হল।

প্রাচীন জায়গা। অন্তত আদি শঙ্করাচার্যের আমলের শহর। উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করে বদরী-নারায়ণ বিগ্রহের উদ্ধার ও বদরী-ধামের মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে আচার্য শঙ্কর এই জায়গায় বসবাসের উপযোগিতা দেখে এখানে এক মঠ স্থাপনা করেন। বস্তুত শুধু এখানে নয় ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম চার প্রান্তেই চারটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরীমঠ, পূর্বে পুরীর সমুদ্রোপকূলে গোবর্ধন মঠ এবং পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ। এই চার মঠ চার ধাম নামে পরিচিত। যাত্রীদের পক্ষে এই চার ধামে তীর্থযাত্রা করতে যাওয়াই প্রশস্ত। এরই অনুকরণে হিমালয়ে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার ও বদরী এই চার তীর্থকেও চার ধাম বলা হয় এবং যাঁরা

এই চার তীর্থই ঘুরে এসেছেন তাঁরা চার ধাম করেছেন এই রকম কথাই সাধারণত বলা হয়।

জোশিমঠে নৃসিংহ-বদরীর মন্দির। কার্তিক মাসের শেষে অন্যান্য ধাতুবিগ্রহের সঙ্গে বদরী-নারায়ণের ধাতুবিগ্রহকে এখানে নিয়ে আসা হয়। মূল প্রস্তরবিগ্রহের সামনে ধূপ দীপ ও ভোগ সাজিয়ে মন্দির তালাবদ্ধ করে পূজারীরাও এখানে নেমে আসেন। অন্যান্য লোকেরা ঘরদোর বন্ধ করে তার আগেই নিচে নেমে আসে। শীতের ছয়মাস সমগ্র বদরিকাশ্রম যখন বরফে ঢাকা থাকে তখন এখানেই সেই প্রতিনিধি-স্থানীয় ধাতুবিগ্রহের পূজা-অর্চনা হয়। বদরীনাথের পূজারী রাওলদের এখানেই স্থায়ী নিবাস। এঁরা দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ। এখন পরিষ্কার পাহাড়ি বনে গেছেন। মাতৃভাষা বলতে পারেন কিনা সন্দেহ। এখানে এঁদের বড় বড় বাড়িঘর, জোতজমি, সম্পত্তি, ভাল ভাল ফুল ফলের বাগান। রীতিমত শাঁসালো লোক।

বেশ বড় বাজার। থানা, ডাকঘর, তারঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় সবই আছে, মায় একটা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় পর্যন্ত। পাহাড়ের উপরে জ্যোতির্মঠে চতুষ্পাঠীও আছে। চার দিকে বেশ চাষ-আবাদ। ঝরনার জলকে নানা রকম কাজে লাগানো হয়েছে। রাওলদের ফুলবাগানে এ সময়েও বিস্তর গোলাপ ফুটে রয়েছে। খুব বড় বড় আমেরিকান বিউটি। এধারে ওধারে অনেক ব্রহ্মকমলের গাছ। এখন গাছে ফুল নাই। গাছ দেখে বুঝলাম ব্রহ্মকমলেরই বিলিতি নাম ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। আমাদের দেশে দেশী নামটার প্রচলনই নাই।

খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করার সময় সুশ্রী চেহারার একটি স্থানীয় যুবক এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলে। নাম পূরণচাঁদ। পাহাড়ের উপরে পাশের গাঁ। সেখানে তার বাড়িঘর চাষবাস আছে। অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। এদিকে বেড়াতে

এসেছিল। ধরমশালায় যাত্রী দেখে এগিয়ে এসে আলাপ করল। বেশ মিষ্টি স্বভাব ছেলেটির।

বৈকালে পাহাড়ের উপরে জ্যোতির্মঠ দেখতে গেলাম। এ শঙ্করাচার্যের প্রাচীন মঠ নয়। এ হাল-ফ্যাশানের আধুনিক বড় লোকদের বাড়ির মতই। প্রাচীন মঠের এতটুকু ধ্বংসাবশেষও আর বর্তমান নাই। অথচ এক সময়ে চার মঠের মধ্যে এই মঠেরই খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল বেশি। শোনা যায় এখানকার গ্রন্থাগার ছিল অপূর্ব। সাধুসন্ন্যাসী, শিষ্যসেবক, বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকে সমস্ত জায়গাটি গমগম করত। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধ্যান-ধারণা, ধর্মসাধনার এটি ছিল একটি মর্মকেন্দ্র। লোকে বলে আদি শঙ্করাচার্য এখানে সাধনা করেছিলেন।

সে সকলের এখন কিছুই নাই। প্রাচীন মঠ ধ্বংস হয়ে গেছে। গেছে তার প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার। লুপ্ত গরিমাকে ব্যঙ্গ করে সেখানে উঠেছে এক আধুনিক ধরনের অট্টালিকা। সংস্কৃত পঠনপাঠনের একটা ধারা বজায় রাখার চেষ্টা এখনও কিছু কিছু আছে বটে কিন্তু তা ছাড়া আর কি আছে বলতে পারি না। মঠের বর্তমান সীমানার মধ্যে ঢুকে দেখি পূরণচাঁদ সেখানে। সে আমাদের সব দেখালে। চার পাশে অনেকখানি জায়গা। মাঝখানে দোতলা মঠ-ভবন। সামনে কিছু ফল ফুলের বাগান। আপেল গাছে আপেল ধরেছে। দোতলার মাঝের ঘরে শঙ্করাচার্যের গদি। সেখানে তাঁদের ঐশ্বর্যের নানা রকমের অভিজ্ঞান। বার্ষিক উৎসবের সময়ে সেগুলি ধারণ করে শঙ্করাচার্যকে গদিতে বসতে হয়। শঙ্করাচার্য এখানে নাই। তাঁকে দেখা হল না। ছোট একটি গ্রন্থাগার নূতন করা হয়েছে। সেটিও দেখার সুযোগ হল না। মঠের চতুঃসীমার এক প্রান্তে একটি প্রাচীন তুঁতগাছ ও পুরোনো আমলের একটি গুহা। লোকে বলে ঐ গুহায় ও তুঁতগাছের তলায় আদি শঙ্করাচার্য সাধনা করতেন। কাছাকাছি একটি ছোট গুহায় একজন সাধুকে দেখলাম। শুনলাম

তাঁর বয়স এক শ বছরের উপর। হিমালয়ে সকল তীর্থই তিনি অনেকবার করে ঘুরেছেন। সম্প্রতি দশ বারো বছর ওখানেই। মঠের সীমানার মধ্যেই পূর্ণগিরি দেবীর মন্দির। ছোট, হালেই তৈরি হয়েছে।

পূরণচাঁদ

পূরণচাঁদ সঙ্গে থেকে সব যত্ন করে দেখাল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তাই তাড়াতাড়ি ধরমশালায় ফিরে এলাম। পূরণচাঁদ গল্প করতে করতে সঙ্গেই এল। বাজারটা একটু দেখে নিয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ের বারান্দায় বসে স্বল্পালোকে কয়েকখানি চিঠি লিখে ফেললাম। ডাক্তারবাবু ছেলেমানুষ, উত্তর প্রদেশের লোক। খুব সজ্জন ব্যক্তি। বললেন, যাত্রী সমাগমে এখানে অস্থায়ী ভাবে থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় বসে। শীঘ্রই এখানে স্থায়ীভাবে থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের পত্তন হবে।

সন্ধ্যা হতেই সুধীরবাবু ও আমি ধরমশালায় ফিরলাম। দেখি, পূরণচাঁদ বেশ গল্প জমিয়েছে। চা-সাহেব ইতিমধ্যে কয়েকটি বড় গোলাপ সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। তিন পয়সায় চারটি। মনে হল বিনানুমতিতে রাওলদের বাগান থেকেই ফুল তুলে এনে কেউ বিক্রি করেছে। ফুল পেয়ে মেয়েদের খুব আনন্দ। চা-টা খেয়ে জমাট হয়ে পূরণচাঁদের দেশের কথা শুনতে লাগলাম। ওদেশের লোকেদের জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো কথা। কি খায়, কি পরে, কাজ-কারবার রুজিরোজগার কি রকম, সামাজিক রীতিনীতির বিষয় সব খুঁটিনাটি প্রশ্ন হতে লাগল ; শোনা গেল, ওদেশের লোক সাধারণত নিরামিষ খায় বটে কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে মাংস খাবার কোন বাধা নাই।

বাল্যবিবাহ ওদের মধ্যে চল নয়। সেয়ানা হলেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়। বাপ-মায়েই বিয়ে ঠিক করে। মেয়ের গয়না-গাটি, বাসন-কোসন, মায় বিয়ের দিনের ভোজের খরচ পর্যন্ত বরপক্ষকে দিতে হয়। মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়েতে একটি কানাকড়িও খরচ করে না। কথায় কথায় পূরণচাঁদের বিয়ের কথা উঠে পড়ল। সে সলজ্জে স্বীকার করলে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আসছে মাসেই তার বিয়ে হবে। তার শ্বশুর এই কয় মাসের জন্য জোশিমঠেই চায়ের দোকান দিয়ে বসেছে। সপরিবারে এখন এখানেই আছে। কোথায় তার দোকান জিজ্ঞাসা করাতে আঙুল দিয়ে সে সামনের একটি দোকান দেখিয়ে দিলে। দেখি ধরমশালার ঠিক সামনেই রাস্তার ওপাশে জলের নলের ধারে সে বাড়ি। আমাদের দোতলা থেকে বাড়িটা দেখা যায়, কাজেকর্মে বাড়ি থেকে লোক বাইরে এলেও দেখা যায় কিন্তু বাড়ির ভিতরটা দেখা যায় না। বেচারা পূরণচাঁদ! এতক্ষণে ঘুরঘুর করে এখানে আসা আর আমাদের সঙ্গে বারান্দায় বসে বসে গল্প করার রহস্যটা বেশ প্রাঞ্জল হয়ে গেল। মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে উঠলেন কিন্তু বেচারির মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে কি না তা বোধ হয় তাঁদেরও অজ্ঞাত রয়ে গেল।

গল্প করতে করতে কোন দিক দিয়ে সময় কেটে গেছে কেউ জানতে পারে নি। বেশ অন্ধকার হয়েছে। কেমন করে বাড়ি ফিরবে জিজ্ঞাসা করাতে পূরণচাঁদ বলল, অল্প দূর আর চেনা রাস্তা। তার যেতে কোন কষ্ট হবে না। যাবার সময় বললে, তার একটা ফোটো তুলে দিতে হবে। আমরা বললাম, কাল ভোরে তো আমরা বদরী যাচ্ছি, ফেরার পথে হবে। সে বলল, সেও পরের দিন কাজ উপলক্ষে বদরী যাচ্ছে। বোধ হয়, আমাদের আগেই পৌঁছোবে। সেখানে তার ফোটোটা তুলে দিতে হবে।

বদরী এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল। আর দু এক দিনের

মধ্যেই বদরী পোঁছে যাবো। এখানকার উচ্চতা ৬,১০০ ফুট। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা।

পরের দিন সকালে একটু দেরি করেই ওঠা হল। মুখ ধুতে জলের নলে গেছি। পূরণচাঁদের হবু-শ্বশুরবাড়ি থেকে বাসন-হাতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। আঠার উনিশ বৎসর বয়স। ফরসা রঙ। নাকমুখ পূরণচাঁদের মত অতটা চোখা না হলেও সাধারণ পাহাড়িদের মতও নয়, মাঝামাঝি রকমের। গাল থেকে রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে। অটুট স্বাস্থ্য। নিটোল গড়ন। মুখশ্রী সুন্দর। মহামায়াকে ভালই লাগল। কেবল মুখ দেখে বোঝা গেল না, দেবী কাল পূরণচাঁদের প্রতি প্রসন্না হয়েছিলেন কি না। জল নেবার ছলে একবারও কি ভক্তকে দেখা দিয়েছিলেন ? জানি না, দেবতা আর ভক্তই শুধু সে কথা বলতে পারেন।

বিষ্ণুপ্রয়াগ

চা-টা খেয়ে বেরুতে রোদ উঠে গেল। যাবার পথে বুনিয়াদি বিদ্যালয়টি দেখে গেলাম। জন দুই শিক্ষক। চল্লিশ পঞ্চাশটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলি বেশ হাসিখুশি। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। এদেশে পশমের সুতোকাটার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখাবার কথা। ছোট কৃষিক্ষেত্রও আছে। পশমকাটার চরকা দেখলাম। মাধ্যমটা ঠিক পালন করা হয় কি না সন্দেহ। তবু ছেলেমেয়েদের দেখে খুব খুশি হলাম। চা-সাহেব ছেলেমেয়েদের ফোটো তুললেন। শিক্ষকের ঠিকানা নেওয়া হল ফোটো পাঠিয়ে দেবার জন্য। নমস্কার করে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে জয় বদরী বিশাল বলে বিষ্ণুপ্রয়াগের পথে নেমে পড়লাম।

নামা তো নয়, রীতিমত দৌড়োনো। দুই মাইলে প্রায় হাজার

ফুট নেমে যাওয়া। ধীরে নামতে হলে লাঠি, পায়ের পাতা ও হাঁটুর উপর জোর দিতে হয় বেশি। দৌড়োলে সমস্ত শরীরের উপর জোরটাকে চারিয়ে দেওয়া যায়। তাই দৌড়োনোই এ রকম রাস্তায় প্রশস্ত!

সোজা নেমেই বিষ্ণুপ্রয়াগ। জোশিমঠ থেকে এক রকম দেখা যায় বললেই চলে। একটা ছোট বিন্দুর মত। কতকগুলি ছোট ছোট সরল রেখায় ভাগ হয়ে রাস্তাটি তির্যকগতিতে দ্রুত নেমে গিয়েছে। একটা ভাগ আর একটা ভাগের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ করে ডাইনে-বাঁয়ে করতে করতে ছুটে চলেছে। কোথাও সুষম বাঁকের কোমলতা নাই। কতকগুলো সূক্ষ্মকোণ যেন একান্তভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে পাহাড়ের গায়ে ফুটে রয়েছে! রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে তীক্ষ্ণ কোণগুলো চোখকে পীড়িত করতে লাগল।

সমস্তটাই একই প্যাটার্নের রাস্তা। বিদ্যুৎঝলকের মত আঁকা-বাঁকা অথচ সুগোল বঙ্কিম নয়। উপর থেকে দেখলে মনে হয় চোখের সামনে অল্প পরিসরের মধ্যে রাস্তার একটা কুটিল জাল নিচ পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে। রাস্তার এক ধারে পাহাড়ের ঢালু গায়ে কিছু ছোট ছোট আবাদি জমি রয়েছে। একটা নেমে-আসা ঝরনা থেকে জলের ব্যবস্থা। ঝরনাটাকে তিন ভাগ করে তিন দিক দিয়ে নামানো হয়েছে। তাই একই ঝরনা তিন বার পার হতে হল।

বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকনন্দা আর ধবলা বা ধৌলি নদীর সঙ্গম। ধৌলির জল সাদা, অলকনন্দার জল কালো। নদী এখানে বেশি চওড়া নয়। উপরের দিকে পাহাড়ের চাপে পড়ে নদী ক্রমেই সরু হয়ে গিয়েছে। এখানেও বেশি জায়গা পাওয়া যায় নাই। নদীও তাই শীর্ণকায়া। গর্জনের কিন্তু বিরাম নাই। জলের তোড়ও কম নয়। তবে রুদ্রপ্রয়াগের প্রচণ্ডতা অবশ্য কোন প্রয়াগেই নাই, এখানেও নাই। নিকটে জয়-বিজয় পর্বতে নারদ ঋষি বিষ্ণুর তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। তাই এর নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ।

ধৌলির উপরে ছোট একটি কাঠের পুল। সেটি পার হয়ে সঙ্গমে যেতে হয়। সঙ্গমের উপরেই ছোট বিষ্ণুমন্দির। তার নিচে দিয়ে বাঁধানো ঘাট ও সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। সমস্তটা সিঁড়ি নাই। খানিকটা ঢালু করে বাঁধানো। তারপরে কয়েকটা বাঁধানো ধাপ। আবার খানিকটা ঢালু করে বাঁধানো। এই রকম করে অনেকটা নিচুতে নেমে জল। আমরা আর নিচে গেলাম না। মেয়েরা জল স্পর্শ করে ও মাথায় দিয়ে আমাদের জন্য জল নিয়ে এলেন। আমরাও জল মাথায় দিলাম। বিষ্ণু দর্শন করে, চা খেয়ে, খানিকটা বিশ্রাম করে, আবার পুল পার হয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম।

বিষ্ণুপ্রয়াগকেই বদরিকামণ্ডলের দরজা বলা যেতে পারে। এখান থেকেই গন্ধমাদন পর্বতশ্রেণীর আরম্ভ। ভিন্ন ভিন্ন পর্বতশৃঙ্গের এখান থেকেই আলাদা আলাদা নামকরণ আরম্ভ হল। অলকনন্দার দুই ধারে পাহাড়ের গা ক্রমে রুক্ষ ও বন্ধুর হয়ে উঠছে। অথচ ফাঁকে ফাঁকে দূরে ঘন গাছপালা ও বনজঙ্গল দেখা যাচ্ছে। পাণ্ডুকেশ্বর পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে মাথায় ঘন অরণ্যানীর এই বিচিত্র সম্ভার। লাম্‌বাগড়ের পরে অরণ্যের অবসান।

নদীরও চেহারা বদলাতে আরম্ভ করেছে। নদী ক্রমেই শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে চলেছে। নদীগর্ভেও বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড জলের উপরে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা দুদিকের পাহাড় নদীর দুই গায়ে এমন ভাবে চেপে ধরেছে যে দুর্গম সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্যে জলধারার গতি বারংবার প্রতিহত হচ্ছে। আক্রোশে সে ফেঁপে ফুলে গর্জন করে উঠছে কিন্তু পর্বতের অলঙ্ঘ্য বাধাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারছে না। গিরিদুহিতার এ যেন শীর্ণ তপস্বিনী মূর্তি। তপস্যার ক্লেশে ক্লিষ্ট কিন্তু তপস্যার অমিত তেজ ও দুর্জয় শক্তিতে সমস্ত ক্লেশকে অতিক্রম করে চলেছে, বাধা-বিপত্তিতে অভিভূত হয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ছে না।

পাণ্ডুকেশ্বর

পথে বলদেও চটি পার হয়ে দুপুরে, জোশিমঠ থেকে ছয় সাত মাইল দূরে, ঘাটচটিতে এসে খাওয়া দাওয়া করা গেল। বিকেলে ঘাট থেকে বেরিয়ে ১৫ই মে সন্ধ্যায় দু মাইল দূর পাণ্ডুকেশ্বরে গিয়ে কালি কমলিওয়ালার ধরমশালায় ডেরাডাণ্ডা গাড়লাম।

ঘাট থেকে পাণ্ডুকেশ্বরের রাস্তা অনেকটা সমতলের মত। উঁচু-নিচু প্রায় নেই বললেই হয়। বস্তুত বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে পাণ্ডুকেশ্বর পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাতেই চড়াই-উতরাই মোটামুটি মামুলি রকমের। ঘাটের পর থেকে ঝোপঝাড় গাছপালা যথেষ্ট দেখতে পেলাম। আশপাশে চাষ-আবাদও বেশ আছে। মেয়ে-পুরুষ মাঠে কাজ করছে। ছোট ছোট যন্ত্রপাতি। পাণ্ডুকেশ্বরকে ঘিরে যে পর্বতমালা রয়েছে তাতে ঘন বন। থাক থাক গাছপালা যেন পর পর উঠে গেছে। ও-সকল গভর্মেন্টের অরণ্য-বিভাগের এলাকা, কিন্তু এ সকল জায়গায় কাঠ নিয়ে যাওয়ার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

পাণ্ডুকেশ্বর বড় জায়গা। অনেকগুলো চটি। বাজার, ধরমশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়—সবই আছে। এখানে যোগবদরীর মন্দির। মন্দিরে বদরীমূর্তি। লোকে বলে এ মন্দির পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠিত। নিকটেই পর্বতশিখরে না কি পাণ্ডুরাজা সপরিবারে বাস করতেন। পাণ্ডবদের জন্ম এখানেই হয়েছিল, এ দাবিও এখানকার লোকেরা করে থাকে। এ সকল কথা কতখানি সত্য আমাদের পক্ষে তা যাচাই করা মুশকিল। তবে মহাভারতে বর্ণিত অনেক কাহিনীকেই এখানকার ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এমন হতে পারে যে কুরুপাণ্ডবদের সঙ্গে হিমালয়-অঞ্চলের পাহাড়িদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। আবার এমনও হতে পারে যে আর্যসংস্কৃতির

প্রভাবে পরবর্তীকালে এগুলি এখানে প্রচারিত হয়। সমতলের সকল সংস্কৃতি ও সকল চিন্তা-বিপ্লবের ধাক্কা পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নয়, কিন্তু যে মহাভারত আমাদের কাছে আজকাল পরিচিত সে মহাভারতেও বদরিকাতীর্থের বিষয়ে ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। পাণ্ডবদের তীর্থভ্রমণ এবং মহাপ্রস্থানের ব্যাপারেও এই সকল অঞ্চলের কথা মহাভারতে লেখা হয়েছে। এই মহাভারত যদি প্রামাণ্য হয় তবে এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে মহাভারতের সময়কার আর্যদের সঙ্গে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও আদান-প্রদান ছিল। সে যোগাযোগের প্রকৃতি কি ছিল এবং তার মূলে সত্য কতখানি বিশেষজ্ঞেরা তা ঠিক করবেন।

পাণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছলাম সন্ধ্যার একটু আগে। কালি কমলিওয়ালার ধরমশালায় দোতলায় একটা কুঠরি ও তার সামনেকার বারান্দা দখল করে বেরিয়ে পড়লাম। এদিক ওদিক একটু বেড়িয়ে ডাক্তারখানায় গিয়ে বসলাম। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। সজ্জন লোক। আরও দু একজন এলেন। শুনলাম, শীতকালে এখানে বরফ পড়ে। তখনও এখানে বাসিন্দারা থাকে। তবে মোটামুটি খাবার-দাবার ঘরের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখতে হয়। এমনও হয় যে কয়েকদিন ক্রমাগত বরফ পড়ার ফলে বাড়ির সদর-দরজা হয় তো বরফে ঢাকা হয়ে গেল। তখন ভিতর থেকে খোন্তা-কোদাল চালিয়ে বরফ কেটে দরজা মুক্ত করতে হয়।

সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি দেখতে গেলাম। আলোর ব্যবস্থা ভাল নয়। তাই সর্বত্রই একটা অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। যেন সবটাই একটা রহস্যে ঢাকা। কত কালের মন্দিরে আমরা বিচরণ করছি, কে জানে। কতকালের কতলোকের পদচিহ্ন এখানে। আমাদের কালের পদচিহ্নও কি আগামী কালের মধ্যে বেঁচে

রইবে? রহস্য কি চিরকাল রহস্যই থেকে যাবে, না জ্ঞানের, বোধের, জ্ঞানাতীতের আলোকপ্রভায় সে রহস্য একদিন সমুজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, কে বলতে পারে?

আরতিশেষে ধরমশালায় ফিরে গেলাম। দূরে, পাণ্ডুরাজার পাহাড়ের ওপরে, আর এক পাহাড়ের গায়ে বনের মধ্যে পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরদিকে উঠছে, দেখা গেল। ঘন বন। গাছের মাথার উপরে গাছের মাথা। এমনই সারের পর সার থাক থাক সাজানো। সমস্ত পাহাড় যেন এক ঘন নীল আস্তরণে আবৃত। সেই ঘন নীলের মাথা ফুঁড়ে বেরুচ্ছে এক রাশ ঘন কালো ধোঁয়া। ধোঁয়া দেখা গেল। ধোঁয়া ভেদ করে আগুন বোধ হয় গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠতে পারলে না। কিন্তু, পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। কাজেই বহ্নির কথা অনুমান করে নিতে হল। এ সময়ে বনে দাবানল জ্বলে ওঠে, কিন্তু লোকেরা বললে, ওটা বোধ হয় দাবানল নয়। হয় অরণ্যবিভাগের কর্মচারীরা, আর না হয় তো কোন দুষ্ট লোকে, লাগিয়ে দিয়েছে।

এখানকার বাজার ভাল। মোমবাতি, কেরোসিন তেল সবেরই সুব্যবস্থা হয়েছে। মনের সুখে অনেকের কাছে চিঠিপত্র লেখা গেল। রাতে দেখি বেশ শীত।

১৬ই মে তারিখের সকাল। বৃষ্টির জন্য ভোরে উঠতে দেরি হয়ে গেল। বেশি তাড়াও ছিল না। বদরীনাথের আগেই হনুমান চটি। আজ হনুমান চটিতে গিয়ে রাত্রিবাস করার ইচ্ছা। কাল সকালে সেখান থেকে বদরীনাথের পাহাড়ে ওঠা সহজ হবে। হনুমান চটি এখান থেকে বেশি দূর নয়, ছয় সাত মাইল মাত্র। তাই সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে ওঠার তাড়া বিশেষ কিছুই ছিল না। রেণু স্টোভ জ্বালিয়ে ঘরে চা তৈরি করলে। ভাল চা। উপাদেয় লাগল। চলা ফেরার তাগিদে নিজেদের-চা খাওয়া বড় একটা ঘটে উঠত না। দোকানের পাহাড়ি-চা-ই খাওয়া হত। সে তো

চা নয়—চায়ের বিকল্প। মোরাদাবাদের কলাই-করা গ্লাসে সেই চা গলাধঃকরণ করে নেশার পিত্তিরক্ষে হত, হাত দুটোকেও গরম করে নেওয়া যেত। পাহাড়ের নিচের দিকে গ্লাসগুলো হাতে ধরা যেত না, রুমাল দিয়ে ধরতে হত। উপর দিকে ক্রমে ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত গরম করে নেওয়ার কাজটাও শুরু হয়ে গেল। সে চা খেয়ে নেশার দাবি মেটাতে হত কিন্তু তৃপ্তি হত না। তাই চা-টা সেদিন অত ভাল লেগেছিল।

লাম্‌বাগড়

পাণ্ডুকেশ্বর থেকে বেরোতে বেলা আটটা বেজে গেল। বৃষ্টি থেমে এসেছে। একটু একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়া গেল। পাণ্ডুকেশ্বরের একটু পর থেকেই আসল চড়াই আরম্ভ হল। এক মাইল দূরে বিনায়ক চটি। বৃষ্টির জন্য সেখানে একটু দাঁড়ালাম। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভাবটা কেটে গেল। আকাশ পরিষ্কার হলে দেড় মাইল দূর লাম্‌বাগড়ে গিয়ে দুপুরবেলার জন্য আশ্রয় নেওয়া গেল। বেলা প্রায় দশটায় লাম্‌বাগড়ে পৌঁছলাম। এখানকার কালি কমলিওয়ালার ধরমশালার ঘর এন. এন. সরকারের স্ত্রী স্বর্গত স্বামীর স্মৃতিরক্ষায় তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। ধরমশালাটি বেশ। সেখানেই আড্ডা নেওয়া হল।

বিনায়ক চটি পার হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে উপরে নিচে প্রচুর গাছপালা, বন। সপ্তপর্ণীর মত একরকম গাছে সুন্দর লাল ফুলের গুচ্ছ। সন্ধ্যামণি ফুলের মত নিচেটা লম্বা হয়ে উঠে মুখটা চওড়া হয়েছে। রঙ ঘোর লাল। গুচ্ছে গুচ্ছে ধরে রয়েছে। নিচের দিকে বুনো-কাঠগোলাপের প্রাচুর্য পেয়েছি। উপরে আরও কিছু কিছু বন্য কুসুম দেখা গেল। পাথরের গায়ে লেগে-থাকা

ঘাসের মধ্যে এক রকমের ছোট্ট ছোট্ট বেগুনি রঙের ফুল। এই সময়ে অজস্র ফুটে রয়েছে। বর্ষা-অন্তে নাকি এখানে পুষ্পপল্লবের বিপুল সম্ভার দেখা যায়। রঙে রঙে চার দিক ছেয়ে যায়। এখন সে সকল ফুল নাই। তাই এই বেগুনি রঙের ঘাসফুলের মোটা মালা আর তুলসীপাতার মালা দিয়ে বদরীনারায়ণকে সাজানো হয়, এই ফুলেই বদরীনারায়ণের পূজো হয়। মালা গাঁথবার কৌশল খুব। এ মালা অনেকদিন রেখে দিলে ফুলের বেগুনি রঙটা সাদা হয়ে যায় কিন্তু ফুলগুলি অবিকৃত থাকে। মনে হয় সুন্দর ছোট ছোট কাগজের ফুল।

এখন থেকে রাস্তার চেহারা বদলাতে আরম্ভ করল। গাছপালা ক্রমে বিরল হয়ে এল। পাহাড়ের চেহারা হয়ে উঠল রুক্ষ ও গম্ভীর। পথ হল বন্ধুর। পথসঙ্গী যেন কমে গেছে মনে হল। দিকে দিকে পাহাড়ের চূড়া বরফে মণ্ডিত। কোথাও কম, কোথাও বেশি। কোন কোন পাহাড়ের গা বেয়ে ক্ষীণ জলধারা নেমে আসছে। জলধারার উপরের দিক বরফে স্তম্ভিত। বরফের নিচে থেকে জল গড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে এসে পড়ছে। খুব বড় একটা ঝরনার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা গেল। অনেক উপর থেকে থাকে থাকে প্রচণ্ড কলরোলে নেমে আসছে। আর একটি জলধারা পাহাড়ের মাথা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা নেমে এসেছে। উপরের দিকে কোথাও জমে গিয়েছে বলে মনে হল না। চা-সাহেবকে ফোটো নিতে বললাম। তিনি বললেন, জলধারাটি যথেষ্ট পরিপুষ্ট নয়; ফোটোতে সুতোর মত দেখাবে।

এতদিন দেখে এসেছি নদী, পাহাড় আর বনের শোভা। এবার শুরু হল বরফ আর জলের খেলা। যেখানে সেখানে ঝরনা। পাহাড়ের গা-মাথা বেয়ে অজস্র জলধারা নিচে নেমে এসেছে অলকনন্দার জলধারার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

লাম্‌বাগড়ে বেশ শীত। জল কনকনে ঠাণ্ডা। হাত দিলে

হাত কেটে যায়। স্নান বা অর্ধস্নান চলবে কি না সন্দেহ হল। ধরমশালায় জায়গা দখল করে দোকান থেকে ফ্লাস্কে চা ভরে নিয়ে চা-সাহেব সুধীরবাবু আর আমি এদিক ওদিক দেখতে গেলাম।

লাম্‌বাগড়ের গায়েই দয়ানদী। পাহাড়ের বাঁকের ভিতর দিয়ে এসে অলকনন্দায় পড়েছে। স্বল্প জল। প্রখর বেগ। ছোট বড় শিলাখণ্ডে প্রতিহত হয়ে গতিবেগ আরও দুর্বার হয়ে উঠেছে। কাঠের পুল পার হয়ে এপারে চলে এলাম।

কিছু দূরে রাস্তার পাশে এক বিরাট শিলাখণ্ড। অনেক উঁচু, মাথাটি বেশ প্রশস্ত। তিনজনে সেই পাথরের উপর চড়ে বসলাম। সেখানে বসে চা খাওয়া হল। ফোটো নেওয়া হল। চা-সাহেব তথাগতের বাণী পড়ে শোনালেন। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর লোকেদের উদ্দেশ্যে শান্তির বাণী। হিমালয়ের রৌদ্রপুলকিত আনন্দময় স্তব্ধতার সঙ্গে সেই শান্তির বাণী এক সুরে বাঁধা।

মেয়েরা শেষবারের মত স্নান সারলেন। এর পরে বোধ হয় বরফ-গলা জলে আর স্নান করা চলবে না। আমার অর্ধস্নান মাথায় একটু জল ঢালতে দেখি মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। রোদে পাথরের উপর বসে গা-হাত-পা মুছে নিলাম। খেতে বসে দেখি কোত্থেকে নটে শাকের মত এক রকম শাকের জোগাড় হয়েছে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া গেল। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে বিকেলের আগেই বেরিয়ে পড়লাম। হনুমান চটি পর্যন্ত যেতে হবে। এখান থেকে চার মাইল। চড়াই রাস্তা।

হনুমান চটি

লাম্‌বাগড়ের খুব কাছেই একটি জলধারা স্তম্ভিত হয়ে পাহাড়ের গায়ে লেগে রয়েছে। নিচের দিকটা দয়া নদীর দিকে প্রসারিত। বোঝা গেল তরল অবস্থায় দয়া নদী দিয়েই তার জলনিকাশ হয়। শীত চলে গেছে। মধ্য-গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন। এখনও সে নদীর সুপ্তি ভাঙ্গে নি। সমতলের মুক্তির ডাক এখনও তার কাছে পোঁছোয় নি। তাই এখনও সে সুপ্তিমগ্ন। খুব কাছেই মনে হল। তাই লাম্‌বাগড় ছাড়ার আগে একবার নদীটি দেখার লোভ হল। পাহাড়ের উপর কিছু দূর এগিয়েও গেলাম। কিন্তু নিচের দিকের বরফ বড়ই মাটি-মেশানো, রঙ ময়লা। তাই কাছে যাবার আগ্রহ আমাদের কমে গেল, আর পরের চটিতে পোঁছতে দেরি হয়ে যাবে সে আশঙ্কাও হল। তাই অর্ধপথ গিয়েই নিবৃত্ত হয়ে হনুমান চটির পথ ধরলাম।

চার মাইল পথ কঠিন চড়াই করে সন্ধ্যার গোধূলি-আলোয় হনুমান চটিতে এসে পোঁছলাম। সামনেই পাহাড়। কাল এই পাহাড়ে পাঁচ মাইলে আমাদের প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার ফুট উঠতে হবে। হনুমান চটির উচ্চতা সাড়ে সাত হাজার কি আট হাজার ফুট হবে। বদরীনারায়ণ সাড়ে দশ হাজার ফুট। হনুমান চটির চার দিক পাহাড়ে ঘেরা। সন্ধ্যার স্বল্প আলোকে চার দিকের চেহারা ভাল করে বোঝা গেল না। পরিমণ্ডলে একটা গম্ভীর-গম্ভীর ভাব। লোকজন, দোকানপাতি কম, ধরমশালায় যাত্রীর ভিড় বেশি নয়। বদরীগামী যাত্রী সেদিন কম। একদল যাত্রী মাত্র ফিরে এসেছে। দোকানে চা খেয়ে হনুমানজীর মন্দির দেখে ধরমশালায় ঢুকে পড়লাম। রাত্রে খুব শীত। শীতের

ভয়েই এখানে রাত্রে কেউ থাকতে চায় না। অনেকে লাম্‌বাগড় কি পাণ্ডুকেশ্বর থেকে সোজা বদরীনাথ চলে যায় এবং বৈকালেই সেখান থেকে নেমে পড়ে। তাই বোধ হয় এখানে যাত্রী কম কম মনে হচ্ছে। খানিকটা জল্পনা-কল্পনা করে ঘুমিয়ে পড়া গেল।

১৭ই মে-র সকাল। স্মরণীয় দিন। এত দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, এত দিনের পথকষ্ট, অনিয়মিত জীবনযাত্রা, অনির্দেশ্য অজানা বস্তুর আকর্ষণ ও অন্তরের কায়াতীত অস্পষ্ট লোকের অহেতুক ব্যাকুলতা, এ সকলই আজ সার্থক একটা পরিণতি লাভ করবে। শরীরে আজ কারও ক্লান্তি নেই। সকলেরই চোখে মুখে একটা উৎসাহের দীপ্তি। অভাবিতের সাক্ষাৎ-প্রত্যাশায় সকলেই আজ উদ্বেল।

সকাল সকাল তৈরি হয়ে নেওয়া গেল। ঠিক মনে নাই, মেয়েরা বোধ হয় কিছু খেলেন না। এগিয়ে গেলেন। আমরা চা খেয়ে পরে রওনা হলাম। সুবোধবাবু মেয়েদের সঙ্গে। মাঝখানে চা-গগ, সুধীরবাবু আর আমি। সব শেষে শ্রমিকবাহিনী। 'গগ' কথাটার একটা ইতিহাস আছে। সেটা আগেই বলে নেওয়া উচিত ছিল। মাঝে চা-সাহেব দু চারটে বাঙলা কথা শিখতে আরম্ভ করেন। আমরাও দু চারটে চীনে কথা শিখে নিই। চীনে ভাষায় বড় ভাইকে 'গগ' বলে। সেই থেকে চা-সাহেব আমাদের সকলেরই চা-গগ বা চা-দাদা হয়ে যান।

আজ প্রথম থেকেই চড়াই। 'জয় বদরী বিশাল' বলে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। সকাল বেলা। বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু ঠাণ্ডাকে আজ ঠাণ্ডা বলেই মনে হচ্ছে না। রোদ কেবল উঠেছে, কিন্তু আমাদের দিকটায় পাহাড়ের আড়াল। তাই ছায়ায় ছায়ায় চলেছি। তা ছাড়া এ পাহাড়কে দূর থেকে যতটা নিষ্পাদপ বলে মনে করে-ছিলাম নিকটে গিয়ে ততটা মনে হল না। নিচের দিকটায় বনজঙ্গল না থাকলেও মাঝে মাঝে দুটো চারটে বড় বড় গাছ পাওয়া গেল। তাই এ দিকটা তখনও সকালের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি।

রাস্তা চলছি। চলা ঠিক নয়, যেন পায়চারি করতে করতে চলেছি। এত আস্তে কোন দিনই এখানে চলি নাই। রাস্তা দুরারোহ বলে যে আমাদের গতিবেগ কমাতে হয়েছে এমন নয়। পথ দুর্গম এই হিসাবে যে প্রায় একটানা চড়াই-ই চলেছে। কিন্তু সে দিকে আমাদের নজরই নাই। আমাদের নজর আশে পাশে, উপরে নিচে, সকল দিকে। হাঁটছি, দাঁড়াচ্ছি, ভাল করে দেখে নিচ্ছি। ঐ একটু দাঁড়ানোতেই যথেষ্ট বিশ্রাম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিশ্রামটা লক্ষ্য নয়, দেখাটাই লক্ষ্য। চারদিকের সৌন্দর্য আমাদের সমগ্র মনটাকে চুম্বকের মত টেনে নিচ্ছে। বিশ্রামটা নেহাতই আনুষঙ্গিক, একটা অপ্রত্যাশিত উপরি-পাওনার মত। বস্তুত, এই পথটাতে এত ঘনীভূত সৌন্দর্য যে আগের সৌন্দর্য এর কাছে যেন একেবারে ম্লান হয়ে যায়। তীর্থযাত্রার প্রায় বারো আনা সৌন্দর্যই যেন হনুমান চটি থেকে বদরীনাথের এই রাস্তাটুকুর মধ্যে জমাট হয়ে রয়েছে। যেমন গাম্ভীর্য তেমন অপরূপ সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্যকে আলাদা করে দেখার নয়। দ্রষ্টা, দৃশ্য আর দর্শন এখানে এক হয়ে যায়। থাকে কেবল বিপুল, অপরিসীম, শান্ত একটা পুলকিত স্তব্ধতা। এক এবং অদ্বিতীয়। আর কিছুরই বোধ থাকে না।

অলকনন্দা আমাদের বাঁয়ে। ডাইনে দুরারোহ পর্বতমালা। পাহাড়ের বাঁক পার হয়ে হয়ে চলেছি। দু দিকে খাড়া পাহাড়। মাঝখানে স্বল্পপরিসর অলকনন্দা। তারই পাশে পাশে পাহাড়ের গায়ে রাস্তা, কিন্তু নদীর কোন এক পাড় দিয়েই বেশি দূর চলার পথ নাই। কিছু দূর এ পাড় দিয়ে, তারপর ও পাড় দিয়ে, আবার নদী পার হয়ে এই পাড় ধরে রাস্তা চলেছে। যে ধারে পাহাড়ের গায়ে যে রকম জায়গা পাওয়া গিয়েছে সেই ভাবে রাস্তা তৈরি হয়েছে। রাস্তার অনুসরণ করে আমাদেরও বার বার একই নদী পারাপার করতে হচ্ছে। নদীকে বারংবার বেষ্টন করে আমরা চলেছি।

তুষারক্ষেত্র

ঘোড়শিলের কাছে অলকনন্দার উপরে কাঠের পুল। নদীর পরিসর যেখানে কম সেখানে দুদিকের পাহাড়ের সঙ্গে আটকে এই ধরনের পুল তৈরি করা হয়। ঝোলা পুলের মত এ পুল দোলে না, মজবুতও বেশি হয়। পুল পার হয়ে ওপারে গেলাম। অল্প দূর গিয়েই দেখি সামনে রাস্তার চিহ্নমাত্র নাই। বাঁ দিকের পাহাড়ের উঁচু গা বেয়ে কি যেন সাদা সাদা এক রকমের জিনিস নেমে এসে রাস্তাকে ঢেকে ফেলে নদীর জল পর্যন্ত স্তূপীকৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটি হল একটি তুষারক্ষেত্র। এত দিন শুনে এসেছি, কেদারবদরী যেতে হলে বরফের উপর দিয়ে যেতে হয়। ধারণা ছিল, বরফ হবে কঠিন, মসৃণ, শুভ্র ও পিচ্ছিল। বরফের উপরে পা পিছলে যাবার ভয়েই তো হরিদ্বারে আগায়-তীক্ষ্ণ-লোহা-লাগানো লাঠি নিয়েছিলাম। এখানকার বরফ দেখলাম শুভ্র বটে,—যদিও এই প্রথম তুষারক্ষেত্রে বরফের সঙ্গে অনেকটা মাটি মেশানো ছিল বলে রঙটা অনেকটা ময়লা হয়ে গিয়েছিল,—কিন্তু কঠিন, মসৃণ বা পিচ্ছিল মোটেই নয়। মনে হল পাহাড়ের উপর থেকে নদীর কিনার পর্যন্ত নুনের আর একটা ছোট পাহাড় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

গুঁড়ো নুনের মত ঝুরো বরফ। হাতে করে তুলে নিলাম। চেপে চেপে বল পাকালাম। বলটা একটু শক্ত হল। হাতের কাছে বরফ পড়ে রয়েছে। যত ইচ্ছে কুড়িয়ে নিলেই হয়। সমতলবাসীর কাছে এ একটা অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। বরফ নিয়ে সবাই উন্মত্ত হয়ে উঠল। কি যে করবে কেউ ঠিক পায় না। পেছনের এক যাত্রীর দল এসে পড়ল। তারা তো বরফ তুলেই প্রথমে মুখে

দেবার চেষ্টা করল। অতি কষ্টে তাদের নিরস্ত করা গেল। একে তো মাটিমেশানো বরফ। তার উপরে এখানে ঠাণ্ডা বরফ পেটে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হিল-ডায়রিয়া।

পাহাড়ের একটা নদী এখানে গোটাগুটি জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। ভিতর থেকে স্তরে স্তরে জমেছে। উপর থেকেও তুষার বৃষ্টি হয়েছে। ভিতর দিকের বরফ চাপে কঠিন হয়ে গেছে কিন্তু উপরের বরফ সবই ঝুরো। পা রাখলে ঠিক পেছলায় না, বরং দেবে যায় বা ঢালু কিনারে পড়লে হড়কে যায়। শীতকালে এ অঞ্চলের সবটাই বরফে ঢাকা হয়ে গিয়েছিল। এখন সব দিকের বরফ গলে গিয়েছে। নদীগুলো এখনও পুরো গলতে পারে নি, কিন্তু ভিতর থেকে গলতে শুরু করেছে। উপরে বরফের উপর দিয়ে আমরা চলেছি বটে কিন্তু ভিতর দিয়ে এর জলপ্রবাহ অলকনন্দায় গিয়ে পড়েছে। অলকনন্দায় কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা বরাবর জলই দেখতে পাচ্ছি।

লাঠি ঠুকে ঠুকে বরফের উপর দিয়ে চলেছি। লাঠি দিয়ে দেখতে হচ্ছে ভিতরের বরফ গলে গিয়ে উপরের বরফ কোন জায়গায় বেশি পাতলা হয়ে গেছে কি না। সে রকম জায়গায় পা তো দেবেই যেতে পারে, এমন কি গোটা মানুষটাও গলে গিয়ে তুহিনস্রোতে মগ্ন হয়ে যেতে পারে। চা-সাহেব অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি এ বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক করে দিলেন। পদক্ষেপ গুনে গুনে আন্দাজি একটা মাপ নেবার চেষ্টা করলাম। প্রথম তুষারক্ষেত্রের বিস্তৃতি হল দুই শ চল্লিশ ফুট।

এক দিকে বেশি দূর যাওয়া গেল না। আবার অলকনন্দা পার হয়ে এপারে আসতে হল। নদী রইল আমাদের বাঁয়ে। ডাইনে পাহাড়। কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ নিচে চেয়ে দেখি অলকনন্দা আমাদের অগোচরে কখন যেন জমে গিয়েছে। আমরা খেয়ালই করি নাই। নীরব তার কলকলভাষ। নিরুদ্ধ তার যৌবনের উচ্ছল আবেগ।

সমস্ত নদীগর্ভ জমে বরফস্তূপ বা তুষারক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিপজ্জনক বটে, কেন না বরফের নিচে দিয়ে নিশ্চয়ই অন্তঃসলিলা নদীর ক্ষীণ প্রবাহ বয়ে চলেছে, কিন্তু মনে হল, সতর্ক হয়ে গেলে হেঁটেই নদী পার হওয়া যায়। সামনে আবার বরফ। বরফে রাস্তা ঢেকে গেছে। রাস্তার ঢালু কিনারা দিয়ে ঢালু হয়ে বরফের স্তূপ নেমে গিয়ে নদীর বরফস্তূপের সঙ্গে মিশে গেছে। ডান দিকের নদীটিকে যত দূর দেখা যায় বরফ দিয়ে ঢাকা। চওড়া বেশি নয়, কিন্তু যত দূর থেকে বয়ে এসেছে সমস্তটাই ধবধবে সাদা বরফে ঢাকা। প্রথম তুষারক্ষেত্রের মত এ বরফের রঙ ময়লা নয়, পরিষ্কার সাদা। একেবারে রূপোর মত সাদা। রোদ প্রখর হলে ঝকঝক করতে থাকে।

পার্বত্য নদীটির উপরে বরফের পুরু আস্তরণ বটে, কিন্তু ভিতরের বরফ ফোঁটায় ফোঁটায় গলতে আরম্ভ করেছে। আমাদের ডান দিক থেকে নদীটি এসে রাস্তার উপর দিয়ে উপচে অলকনন্দায় গিয়ে পড়েছে। রাস্তার ডাইনে থেকে আরম্ভ করে বরফের স্তূপ অলকনন্দার বরফের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। কাজেই রাস্তার সামনে আর একটি তুষারক্ষেত্র আমাদের পার হতে হবে। তুষারক্ষেত্রটি আরম্ভ হবার একটু আগেই রাস্তার উপরকার বরফ গলে গিয়ে রাস্তা কিছুটা পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে, অথচ সেখানটায় ডান দিকের তুষারস্তূপ উঁচু হয়েই রয়েছে। তার নিচু থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে বরফ গলে পড়ছে। ফলে তুষারক্ষেত্র আরম্ভ হবার আগেই একটি ক্ষীণ জলধারা রাস্তার উপর দিয়ে বাঁ দিকে বয়ে চলেছে। সেই জলধারা পার হয়ে আমাদের তুষারক্ষেত্রে পড়তে হবে। এ দিকে বরফ গলার ফলে ডান দিকের তুষারস্তূপের ভিতরের দিকে একটা গুহার সৃষ্টি হয়েছে। গুহার ভিতরটা গরুর গাড়ির ছইএর মত গোলাকার। গুহার ছাত ও দু পাশের দেওয়ালের গা মসৃণ নয়। সমস্ত গায়ে মৌচাকের মত ছোট ছোট খোপ হয়ে রয়েছে। বেশ

বোঝা গেল, সব জায়গা থেকে সমান ভাবে বরফ গলে পড়ছে না। কোন জায়গা থেকে একটু বেশি, কোন জায়গা থেকে একটু কম গলে পড়ছে। কেন এ রকম হচ্ছে বোঝা গেল না। গুহাটি বাইরে থেকে দেখতে এস্কিমোদের ঘরের মত হয়েছে, তবে ঢোকার দরজাটি তাদের ঘরের দরজার মত নিচু ও ছোট নয়।

ক্ষীণ জলধারাটি খুবই ক্ষীণ। হেঁটেই পার হওয়া গেল। তুষারক্ষেত্রে পড়ে দেখি মেয়েরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। বরফের উপরে সকলের ফোটো তোলা হবে। ঢালু দিকে নদীর ধারে খানিকটা বিস্তৃত তুষারক্ষেত্রের মধ্যে আমরা সার করে দাঁড়ালাম। মেয়েরা বরফের বল তৈরি করে হাতে করে দাঁড়ালেন। একবার সুবোধবাবু, আর একবার চা-সাহেব ছবি তুললেন। ছবি তোলা হলে সকলে মিলে বরফের গুহাটির ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। বেশ বড় সুড়ঙ্গের মত গুহাটি। অনেকটা উঁচু। ছাত আমাদের মাথার চাইতে ছয় আঙুল আট আঙুল উঁচু হবে। গুহার মুখে রেণুকে দাঁড় করিয়ে একটা ফোটো নেওয়া হল। তুষারক্ষেত্রটি পার হবার সময় এক জায়গায় চা-সাহেবের একটা পা একটু বেশি দেবে গেল। লাঠির উপর ভর দিয়ে পা-টিকে টেনে তুললেন। আমরা একটু ঘুরে গেলাম। তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে একটিমাত্র সরু পদচিহ্নের পথ। আমাদের ডান দিকটা উঁচু, বাঁ দিকে ঢাল। বদরীনারায়ণ থেকে ফিরতি জনকয়েক হিন্দুস্থানী মেয়ে এলেন। জয় বদরী বিশাল, জয় বদরী বিশাল। বরফের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে একটু ভয় পাচ্ছেন, একটু অসামাল হয়ে পড়েছেন, রাস্তার উঁচু দিকটা তাঁদের ছেড়ে দিয়ে ঢালের উপর লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁরা আশ্বস্ত হয়ে পার হয়ে গেলেন। আমরাও উঠে এসে পদচিহ্ন অনুসরণ করে তুষারক্ষেত্র পার হলাম।

সামনেই অকলঙ্ক তুষারমণ্ডিত গিরিশীর্ষ। আলোয় ঝলমল করছে। যে দিকে চাই, উঁচু নিচু পাহাড়ের মাথা থেকে ছোট বড় জলধারা ও ঝরনা নেমে এসেছে, তাদের জলের সম্ভার নিয়ে অলকনন্দাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্য। তাদের আকুল গতি কোথাও একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে, কোথাও বা মাঝে মাঝে রুদ্ধ হয়েছে, মাঝে মাঝে ছাড়া পেয়েছে। কোথাও বা উপরের তুষারস্তম্ভনকে মেনে নিয়ে রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অন্তঃসলিলা হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কোনও ঝরনার তরলতা তুষার-জড়তা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেয়ে নাচতে নাচতে নিচে নেমে আসছে। কোন জায়গা তার জমাট বরফে আচ্ছন্ন নাই। দিকে দিকে পাহাড়ের গায়ে তুষারস্তম্ভন। অনুর্বর রুক্ষ প্রস্তরময় যে পাহাড়ের মাথায় বরফের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তারও গা বেয়ে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রলম্বিত রয়েছে তুষারের ধবল জটা। অনেক ঝরনা আবার পাহাড়ের মাথা থেকে নামে নি। ওপরেরই কোন জলধারা গুপ্তভাবে ভেতর দিয়ে চুইয়ে পাহাড়ের মাঝামাঝি গা ভেদ করে জলপ্রপাতের মত বেরিয়ে এসেছে ও পাথরের গা বেয়ে না এসে ওপর থেকে কিছু নিচে লাফিয়ে পড়ে তারপর বয়ে চলেছে।

পায়ের নিচে তুষার, আশে পাশে তুষারমণ্ডিত গিরিচূড়া, তুষারস্তম্ভিত অলকনন্দা। এ যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নপুরী। তপোমগ্ন ধূর্জটির সুপ্তিমগ্ন তপোবন। সমাধিমগ্ন দেবাদিদেবের নিস্তরঙ্গ মহাসমাধি। ঠিক মহাসমাধিও নয়। যথার্থ মহাসমাধির স্থান আরও উপরে, আমাদের নাগালের বাইরে, পর্বতের সেই চিরতুহিনাবৃত শীর্ষদেশে যেখানকার তুষারের রসস্রুতি নাই। এখানে

মহাসুপ্তি আছে, কিন্তু সে সুপ্তির প্রগাঢ় নিবিড়তা যেন একটু পাতলা হয়ে এসেছে। অখণ্ড সংহতির মধ্যে পরিচ্ছিন্নতার জন্য একটা আবেগ যেন অন্তরে স্ফুরিত হয়ে উঠেছে।

ধ্যানমগ্ন প্রকৃতিতেও তারই আভাস। অলকনন্দার নিরেট তুষার-আচ্ছাদনেও চিড় দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে বেশ বড় ফাটল ও গর্ত। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভিতরকার বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যেন অন্তর্ভৌম জলের প্রবাহ চলেছে। বরফের আচ্ছাদন যে কিছু পাতলা এমন নয়। ঘন, পুরু, কঠিন বরফ, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। উপরে গুঁড়ো বরফ, নিচেকার বরফ স্তরভেদে ক্রমে জমাট ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ভাঙা জায়গায় পাশ দিয়ে বরফের স্তরবিন্যাস বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পর্বতের দেহলগ্ন ঝরনাগুলিরও একই অবস্থা। বাইরের কঠিন আবরণ তাদের নিশ্চল, স্তম্ভিত করে রেখেছে কিন্তু অন্তরের তারল্য ভেতর থেকে দ্রব হয়ে গলে গলে পড়ছে।

জমাট সৌন্দর্য। স্তম্ভিত কালপ্রবাহ। নিস্তব্ধ শান্তি। দেবতা নিজের মধ্যে নিজে সংহত। অখণ্ড কাল ছাড়া এখানে কিছুই নাই। সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষ। প্রত্যূষের যেন আগে। মন একটা নিবিড় সমগ্রতার মধ্যে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এই তো দেবতার স্থান। এই তো পরম তীর্থ। স্মরণাতীত কাল থেকে এইখানেই লোকে এসেছে ভক্তির আকুল আগ্রহ নিয়ে, অন্তরে যিনি গুহাহিত এবং রজতগিরিশিখরে যিনি তপস্যারত, সেই বদরীনারায়ণের কাছে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেবার জন্য।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে রথ-সারথি,..............

সে কোন দেবতা রথের যিনি আরোহী, রথেতেও যিনি অধিষ্ঠিত, আবার রথের সারথিও যিনি? যাত্রী, যাত্রা ও দেবতা তিনে এক

অথচ একে তিন ? অপরূপ সে দেবতা। নিরলঙ্কার ঐক্য তাঁর বৈচিত্র্যের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে না। বৈচিত্র্যের অলঙ্কৃতি তাঁর অবাধ ঐক্যকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব-শিষ্যতে। পরমাশ্চর্য সেই দেবতা। আশ্চর্যময় তাঁর প্রকাশ।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

অনির্বচনীয় সেই দেবতা। এখানকার জলে স্থলে পর্বতে অরণ্যে, গিরি-প্রবাহিণীর তুহিনমগ্ন নিঃসীম মৌনতায়, গিরিশীর্ষের হিমমণ্ডনের অকলঙ্ক শুভ্রতায়, সেই দেবতারই প্রকাশ। এই প্রকাশ বিপুল, মহৎ, বিশাল। জয় সেই বদরী বিশালের। সেই বিশালকে নমস্কার, ডাইনে নমস্কার, বাঁয়ে নমস্কার, সামনে থেকে নমস্কার, পেছন থেকে নমস্কার। দিকে দিকে তাঁকে নমস্কার। সকল দিক অতিক্রম করে তাঁকে নমস্কার। হাজার রকমে তাঁকে নমস্কার। নমস্কার, নমস্কার, আবার নমস্কার।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

নির্বাক বিস্ময়ে একটা আবেশের মধ্য দিয়ে চলেছি। বহু যাত্রী আগে পাছে। কিন্তু সঙ্গে যেন কেউ নাই। কে আছে, কে নেই তার যেন হিসেবই নাই। চলি আর দেখি, দেখি আর চলি। আলাদা করে যেন দেখছিও না। দেখার সঙ্গে মন একান্ত ভাবে লগ্ন হয়ে গেছে মধুলীন ভ্রমরের মত। চলার আলাদা কোন বোধ নাই। শরীর নিজেই যেন চলে চলেছে। মনের মধ্যে একটানা

সুরের রেশ চলেছে, নমো নমস্তেহস্তু, নমো নমস্তেহস্তু, নমো নমস্তেহস্তু, নমো নমঃ……

জয় বদরী বিশাল, জয় বদরী বিশাল, বদরী বিশাললাল কি জয়। যাত্রীদের মধ্যে বিপুল হর্ষধ্বনি পড়ে গেল। শেষ চড়াই-এর মাথায় উঠে দেখি, সামনে অলকনন্দার অন্য পারে তুযার-মণ্ডিত নারায়ণ পর্বতের গায়ে বদরীনাথ শহর দেখা যাচ্ছে। খেলাঘরের মত ঘরবাড়ি ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সাজানো। মাঝখানে মন্দিরের চূড়ায় পতাকা উড়ছে। যাত্রীদের সে কি আনন্দ! একান্ত অপরিচিত লোক একে অপরকে ডেকে দেখাচ্ছে। এত দিন পরে মনে হল এবার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা গেল। এত দিনের সব কষ্ট আজ সার্থক! শরীরে ক্লান্তি বলে আর কিছু রইল না। নতুন উৎসাহে সকলে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

এখানে দেবমন্দিরের প্রথম দর্শন। তাই এ জায়গার নাম হয়েছে দেবদেখনা। দেবদেখনা থেকে বদরীনাথ মাইল খানেক হবে। রাস্তা সোজা নেমে গেছে কিন্তু ঢাল খুব কম। খুব আরামের রাস্তা। রাস্তার শেষে অলকনন্দার উপরে পুল। ঝোলা পুল নয়, দৃঢ়সংবদ্ধ পুল। এ পারে নরপর্বত, ওপারে নারায়ণ। মাঝখানে উভয়-পর্বত-সংলগ্ন ছোট একটি উপত্যকা। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে অলকনন্দা নেমে এসেছে। ওপারে নারায়ণ পর্বতের গায়ে মূল শহর ও মন্দির। এ পারে নর পর্বতের দিকে বিশেষ কিছু নাই। কয়েকটি সাধুর আস্তানা ও সাময়িক থানা-হাসপাতাল আছে।

অলকনন্দার এখানে দুগ্ধশুভ্র তরল ধারা। তুষারের অবরোধ নাই। মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল গতি। হিমশীতল জল। হিমশীতল নয়, হিমাধিক শীতল। তুষারে যদি বা হাত দেওয়া যায়, এ জলে হাত দেওয়া যায় না। পুল পার হয়েই বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র। সামনেই ঋষিগঙ্গা নদী পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে। পুলের কাছেই এসে অলকনন্দায় মিশেছে। ঋষিগঙ্গার উপরেও একটা পুল আছে। অলকনন্দার পুল পেরিয়ে ঋষিগঙ্গার ছোট পুল পার হয়ে বদরীনাথে ঢুকতে হয়। এবারে ঋষিগঙ্গার পুল আমরা দেখতেই পেলাম না। পাহাড়ের উপর থেকে অলকনন্দার জল পর্যন্ত সমস্ত ঋষিগঙ্গা নদীটা এখনও জমে রয়েছে। পুল টুল সব তুষারস্তূপে ঢাকা পড়ে গেছে। তুষারস্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে আমরা নদী পার হচ্ছি।

শুধু তাই নয়। শীতে তো প্রতিবৎসরই শহর ও আশপাশের সমস্ত অঞ্চল বরফে ঢাকা হয়ে যায়। ঘর বাড়ি মন্দির জমি সবই বরফে চাপা পড়ে। চারদিকে শুভ্র তুষারের অখণ্ড রাজত্ব। তখন এখানে জনপ্রাণীর থাকার উপায় থাকে না। সকলেই নিচে নেমে যায়। মাস ছয়েক এখানে কেউ থাকে না। মন্দিরের দরজা থাকে রুদ্ধ, দেবতা থাকেন হিমসুপ্তিতে মগ্ন, ভক্ত হয় নির্বাসিত। বছর বছরই এই রকম ঘটে। দেবতা আর ভক্তে ছয় মাস চলে বিরহ, ছয় মাস মিলন। এইটেই এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা।

এর ওপরে এবার নতুন কিছু ঘটেছে। হিমালয় পর্বতমালার পূব ও পশ্চিম ভাগের তুলনায় এই মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত নিচু। পূব ও পশ্চিম দিক থেকে ক্রমে নিচু হয়ে এসে দুই প্রান্ত থেকে

মাঝখানটা বেশ নিচু হয়ে পড়েছে। এই মধ্যভাগের পাহাড়গুলি পনেরো হাজার থেকে আঠারো হাজার ফুটের মধ্যে। তার চাইতে বেশি উঁচু পাহাড় এ অঞ্চলে নাই। গ্রীষ্মকালে এই সকল পাহাড়ের বরফ গলতে থাকে। শীতে আবার নতুন করে বরফ জমে। পাহাড়ের উপর স্তরে স্তরে বরফ পড়ে। ওপরের চাপে নিচেকার বরফ শক্ত কঠিন হয়ে ওঠে। এই বিস্তীর্ণ পুঞ্জীভূত কঠিন তুহিনক্ষেত্রকে হিমবাহ (glacier) বলা হয়। এই সকল হিমবাহই পার্বত্য নদীসমূহের উৎস। মাঝে মাঝে নানা কারণে এই সকল হিমবাহে ফাটল ধরে এবং পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে বিরাট বিরাট বরফের চাপ একটু একটু করে সরতে থাকে। এই সরার ফলে আশপাশের তুষারস্তূপে ধাক্কা লাগে এবং পাহাড়ের ঢালু দিকে ধাক্কার বেগ বাড়তে থাকে। শেষে পাহাড়ের উপর থেকে বড় বড় বরফের চাপ, চাপ বললেও ঠিক ধারণা করা যাবে না, বিরাট বিরাট কঠিন তুষারের স্তূপ প্লাবনের মত প্রবল বেগে নিচে নেমে আসে। এরই নাম তুষারস্খলন বা তুষারপ্রপাত (avalanche)। তুষারপ্রপাতের পথে যে জিনিস পড়ে প্রবল ধাক্কায় সে জিনিস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

এবারে ঋষিগঙ্গায় তুষারপ্রপাত নেমেছিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে কঠিন তুষারস্তূপ প্রবল বেগে নেমে আসে। সমস্ত শহরের উপর সে ধাক্কা পড়ে নাই, কিন্তু বদরীনাথ শহরের যে দিকটায় ঐ ধাক্কা পড়ে, সে দিকের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। মন্দির বা মন্দিরের কাছাকাছি অঞ্চলের কোন ক্ষতি হয় নাই। শহরের ঠিক মুখেই যে তুষারস্তূপের উপর দিয়ে আমরা চলেছি, সে তুষারস্তূপ ঋষিগঙ্গাই। এর নিচে ঋষিগঙ্গার পুল আছে, কিছু কিছু ঘরবাড়িও আছে। বরফ খুঁড়ে লোকেরা ঘরবাড়ির পাথর, কাঠ বার করে নিচ্ছে। একটা ভাঙ্গা ঘরের পাথরের ভিতটা দেখতে পেলাম। ভিতটা যে পাথরের তৈরি তা বোঝাই

যায় না। মনে হয় কঠিন তুষারশিলা দিয়ে ভিতটা তৈরি করা হয়েছিল।

তুষারক্ষেত্র পার হয়ে বদরীনাথ শহরের মাটিতে, মাটি তো নয় পাথরে, পা দিলাম। অবশ্য ঋষিগঙ্গার তুষারক্ষেত্রটিও বদরীনাথের মধ্যেই, তবে এক ধারের প্রান্তসীমা বটে। ১৭ই মে বেলা প্রায় এগারোটায় বদরীনাথ পোঁছলাম। সামনেই লোকগণনা হচ্ছে। কত যাত্রী এল তার একটা হিসেব রাখা হচ্ছে। আমাদের দলের সর্দার হিসাবে সুবোধবাবুর নাম এবং যাত্রীসংখ্যার অঙ্ক লেখা হল। এর মধ্যে আমাদের পাণ্ডা ভট্টজী এসে হাজির। তাঁকে সঙ্গে করে পোস্ট অফিস পার হয়ে, বাজার পার হয়ে সটান মন্দিরে গিয়ে হাজির হলাম। মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ। মস্ত বড় সিংহদরজা, উঁচু হয়ে পথ রোধ করে আছে। রাস্তা থেকে কয়েকটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে সিংহদরজার সামনেকার বারান্দায় উঠতে হয়। বারান্দায় অনেকটা উঁচুতে মস্ত বড় বিরাটকায় একটি ঘণ্টা। আমরা হাতে পেলাম না। রাস্তা থেকে ভিতরকার মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত দেখা যায় না। মন্দিরের উলটো দিকে রাস্তার এক পাশে বাচনালয় অর্থাৎ লাইব্রেরি। মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সকলের এক সঙ্গে দুবার ফোটো নেওয়া হল। একবার সুবোধবাবু ফোটো নিলেন, আর একবার চা-সাহেব। এক-একটা ফোটোয় তাঁরা এক-একজন বাদ গেলেন। ইতিমধ্যে জোশিমঠের সেই পূরণচাঁদ এসে হাজির। তার একটা ফোটো নেবার কথা ছিল। সে আমাদের আগের দিন এখানে এসেছে এবং ফোটো তোলাবার আশায় অপেক্ষা করছে। পূরণচাঁদের ফোটো নেওয়া হল।

ভট্টজীর সঙ্গে তাঁদেরই এক বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। যাত্রীদের জন্য এ সময়ে তাঁদের কিছু কিছু বাসা-বাড়ি ঠিক করে রাখতে হয়। কালি কমলিওয়ালার ধরমশালা ও মন্দিরের মাঝে এই

বাসা। কাঠ-পাথরের দোতলা বাড়ি। দোতলায় একটা ঘর পাওয়া গেল। বেশ বড় ঘর। ভাল দরজা। কাচের জানলা। মেজেতে গালচে পাতা। ধরমশালার টিউবওয়েল কাছেই। সেখান থেকে জল আনতে হয়। ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ভাল। কেবল কাঠের সিঁড়িটা খারাপ। সন্তর্পণে ওঠা-নামা করতে হয়। পায়খানা কিছু দূরে। একটু উপরে উঠে।

যাত্রীদের জন্য সাধারণ পায়খানা অনেকগুলো। মেয়ে-পুরুষের আলাদা আলাদা। পাকাপাকি স্থায়ী বন্দোবস্ত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রচুর জলের ব্যবস্থা। উপরের জল থেকে নল দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। পায়খানার এত ভাল ব্যবস্থা পাহাড়ে আর কোথাও দেখা যায় নাই।

চা-জিলিপি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করা গেল। বদরীনাথ সাড়ে দশ হাজার ফুট উঁচু কিন্তু ঠাণ্ডা খুব বেশি নয়। তবে শুধুহাতে ধাতুনির্মিত চা-এর গ্ল্যাস ধরতে আরাম বোধ হচ্ছিল। শুনলাম, মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ। কাজেই স্নানের ব্যবস্থা দেখতে হল। মন্দির থেকে নেমে গিয়ে একটু নিচেই উষ্ণ প্রস্রবণের মুখ। মন্দিরের ঠিক নিচে ভূগর্ভের ভিতর দিয়ে একটি উষ্ণ জলের প্রস্রবণ ঘুরে ঘুরে বদরীনাথ শহরটিকে বেষ্টন করে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে অলকনন্দায় গিয়ে মিশেছে। এদেরই গতিপথে কয়েকটি কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। কুণ্ড ভরতি হয়ে তপ্ত জল কুণ্ড উপচে নদীতে গিয়ে পড়ছে। নল দিয়ে জল নিয়ে গিয়ে আলাদা কুণ্ডও তৈরি করা হয়েছে। মেয়েদের জন্য এই রকম আলাদা একটি কুণ্ডের ব্যবস্থা আছে। অনেকদিন অবগাহন স্নান করি নাই। গরম জল পেয়ে তপ্তকুণ্ডে নেমে খুব আরাম করে অবগাহন স্নান করা গেল। জল বেশ গরম। নেমে প্রথমে মনে হল গা পুড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই সহ্য হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্নান করে বাসায় ফিরলাম। রান্নার হাঙ্গামা ছিল না।

পাণ্ডাজী নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একটু বেলাতে খাবার এল। বদরীনাথেরই অন্ন-প্রসাদ। কলাই-এর দল। আতপ চালের ভাত। সামান্য ভাজি। ব্যাসনের ঝোলের মত একটু। এক রকমের পায়েস। পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সমাধা করে বিশ্রামে মন দেওয়া গেল।

বৈকালের দিকে চা খেয়ে শহর দেখতে বেরোলাম। প্রথমেই পোস্ট আফিসে গিয়ে কলকাতায় কয়েকটি তার পাঠানো হল। প্রত্যেকটিরই বার্তা হল, 'জয় বদরী বিশাল'। বদরী বিশালের জয় ঘোষণা করেই আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্থানে উপস্থিতির কথা সকলকে জানিয়ে দিলাম।

এক দিকে নর পর্বত। আর এক দিকে নারায়ণ পর্বত। মাঝখান দিয়ে হিমগিরির আশীর্বাদ বুকে করে দুগ্ধশুভ্র ধারায় অলকনন্দা বয়ে চলেছে। দুই পর্বতের মাঝখানে, অলকনন্দার দুই পাড় ব্যেপে, স্বল্পপরিসর ছোট একটি উপত্যকা। সেই উপত্যকার এক দিকে নারায়ণ পর্বতের গায়ে বদরীনারায়ণের মন্দির ও শহর। অপর দিকে নর পর্বতের গায়েও শহরটি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিকে সাধুদের জন্য কয়েকটি কুটির হয়েছে। সাময়িক থানা ও হাসপাতালের বাড়িও সেইদিকে। বড় বড় পুকুরের মত কয়েকটি নিচু জায়গা। সেখানকার জমা-বরফ এখন গলে জল হয়ে কয়েকটি সরোবরের সৃষ্টি করেছে। শরতে সেখানে না কি পদ্মফুল ফুটে থাকে।

শহরটি মাঝারি রকমের। মন্দির, বাজার, কালি কমলিওয়ালার ধরমশালা, পাণ্ডাদের ও মন্দির-কমিটির ঘরবাড়ি, এই নিয়ে শহর। কিছু পরিমাণে আধুনিক সুখ সুবিধা পাওয়া যায় এ রকম একটা হোটেলও না কি আছে। কালি কমলিওয়ালার ধরমশালাটি বেশ বড়। অনেক যাত্রী ধরে। জলের খুব ভাল বন্দোবস্ত। পাণ্ডাদের ঘরবাড়িতে অনেক যাত্রী থাকে। তা ছাড়া মন্দির-কমিটির

বাড়িতেও যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা আছে। শহরে ছয় মাস জনপ্রাণী থাকে না, কিন্তু বাড়িঘরের বন্দোবস্ত বেশ পাকা রকমের। বরফে সব ঢাকা পড়ে যায় কিন্তু তুষারপ্রপাত (avalanche) না হলে বাড়িঘরের কোন ক্ষতি হয় না। সম্ভবত নিচে উষ্ণ প্রস্রবণ থাকায় অত উঁচুতে যতটা ঠাণ্ডা হওয়ার কথা আবহাওয়া ততটা ঠাণ্ডা নয়।

বাজারটি বেশ বড়। শহরে অলকনন্দার ধারে ধারে একটিমাত্র সদর রাস্তা। এই রাস্তার দুই ধারে নানা রকমের দোকান-পসার। দোকানে সমতল ও পাহাড় দুই জায়গার জিনিসই আছে। সমতলের সুতী ও পশমী জিনিস, নানা রকমের মনিহারী ও সৌখিন দ্রব্য, বাসনকোসন এখানে আমদানি হয়েছে। পাহাড়েরও আছে পশমী জিনিস। তা ছাড়া আছে ছোট বড় চামর, জন্তু জানোয়ারের চামড়া, নানা রকমের শিলাজতু, তিব্বতী মালা ও গয়না, আর আছে এখানকার দেবদেবীর তামার পট ও ছবি।

পাহাড়ী লোকেদের শিল্পদ্রব্য বিশেষ কিছু নাই, শিল্পকাজও নাই। পাহাড়ীদের চাষবাসের অবস্থাও খুব ভাল হতে পারে না। পশুপালনের ব্যবস্থা খানিকটা আছে। ব্যবসাপাতি যা কিছু চলে তারও বেশির ভাগ সমতলবাসী উৎসাহী লোকেদের হাতে। কাজেই এদের দারিদ্র্য ঘুচবার নয়। অথচ এদের প্রখর গতিশীল পার্বত্য প্রবাহিনী আছে। অল্প চেষ্টাতেই সেগুলি থেকে এদের প্রয়োজনমত শক্তি উৎপাদন করে তা দিয়ে নতুন নতুন শিল্পকাজের পত্তন করা যেতে পারে। তা ছাড়া রাস্তাঘাটের উন্নতি করে, ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থা করে, তীর্থযাত্রী ছাড়াও নানান দেশের পর্যটকদের যাতায়াত সুগম করে দিলে, এদের আরও সামান্য কিছু আয় বাড়তে পারে। বিদেশী আমলে এদের জন্য কিছুই করা হয় নাই। করবার ইচ্ছাও তাদের ছিল না। তা ছাড়া মতলব করেও করা হয় নাই। বিদেশী সরকার এদের ভিতর থেকে সৈন্যবিভাগের জন্য লোক সংগ্রহ করত। এরা এই রকম

গরিব থাকার জন্য সেই কাজে বিশেষ সুবিধে হত। এখন সে অবস্থা নাই, এখন এদের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত।

সন্ধ্যায় আরতি দেখতে গেলাম। ভারতবর্ষের সকল জায়গা থেকেই লোক এসেছে ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে, ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ সকলে। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, বিভিন্ন সকলের ভাষা, অথচ একটা জায়গায় সকলের অন্তরের মিল। বাইরের সকল দিকেই তারা আলাদা, অথচ একই তারে সকলের অন্তরের বীণা বাঁধা, একই ভাবের আবেগে সকলের অন্তর উদ্বেল।

বদরীনারায়ণের মন্দির

ছোট এই মন্দির। তৈরির মধ্যে গঠন-পারিপাট্য বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। অন্যান্য পাহাড়ি মন্দিরের মতই। পাহাড়ের সকল মন্দিরে অবশ্য গম্বুজ থাকে না। এই মন্দিরের মাথায় বড় গম্বুজ। তার উপরে চতুষ্কোণ ছত্রী বসানো। পুরোনো মন্দির। মাঝে মাঝে মেরামত করা হয়েছে। মন্দিরের গায়ে সেই মেরামতির ছাপ সুস্পষ্ট। সিংহদরজা পার হয়েই বাঁধানো খোলা চত্বর পড়ে। চত্বর দিয়ে মন্দিরটি চার দিকে ঘেরা। চত্বরের এক পাশে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, ভোগশালা, মন্দির-কমিটির ঘর, আর মাঝখানে বদরীনারায়ণজীর মন্দির। মূল মন্দিরের দুইটি কক্ষ। সামনের কক্ষে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা দেবদর্শন করে। ভিতরের গর্ভগৃহে দেবতার বিগ্রহ, চতুর্ভুজ শিলামূর্তি। গর্ভগৃহের দরজার দুই পাশে উঁচু বেদী। সেখানে মন্দিরের ধর্মাধিকারীরা বসেন, প্রণামী নেন ও প্রসাদ বিতরণ করেন।

মন্দিরের সামনের কক্ষে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে দেবদর্শন করলাম। দেববিগ্রহ শৃঙ্গারের বেশে সাজানো। গর্ভগৃহ স্বভাবতই

অন্ধকার। আলোর ব্যবস্থা মন্দ নয়, তবুও সে অন্ধকার পুরোপুরি কাটে নাই। সাজসজ্জায় আসল মূর্তি ভাল করে দেখা গেল না। মন্দিরের প্রধান পূজারী অনেকক্ষণ ধরে নানা রকমে আরতি করলেন। খুব ভাল লাগল। ছোট্ট ঘর। ঘনসন্নিবিষ্ট নরনারী, কিন্তু ঠেলাঠেলি নাই। স্তব্ধ স্থির অন্তর্লীন জনতা। স্পন্দনহীন অখণ্ড শান্তির ঐক্য। দেশ ও কালের ব্যবধান এখানে ঘুচে গেছে। সুদীর্ঘ অতীতে যারা এখানে দাঁড়িয়ে এই আরতির সময়ে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল তাদের তন্ময়তা এই স্তব্ধ গম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে মিশে রয়েছে। ভবিষ্যতে আকুল আগ্রহ নিয়ে যারা এখানে ছুটে আসবে তাদেরও আগমনীর অস্পষ্ট আভাসে এখানকার আকাশ-বাতাস অনুরঞ্জিত। মহাকালের এই পরমস্তব্ধ নিশ্চল মুহূর্তে একটা অখণ্ড বিধৃতির মধ্যে সকলেই বর্তমান রয়েছে। অখণ্ড সত্তার অখণ্ড মনের অখণ্ড শান্তি এই আরতির মধ্যে রূপ নিয়েছে।

সুদীর্ঘ আরতি শেষ হল। শান্তির অখণ্ডতা প্রাণের চাঞ্চল্যে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। নড়াচড়া ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। কে আগে আরতির দীপশিখার স্পর্শ নেবে তারই জন্য কাড়াকাড়ি। জনতার চাপে কোন রকমে আলোর শিখা স্পর্শ করে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মন্দির-কমিটিতে পরের দিন সকালে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করে বাসায় ফিরলাম। আমাদের সকলের এক সঙ্গে পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। তাই এক শ এক টাকা প্রণামী দেওয়া গেল। খুব কমেতেও পূজো দেওয়া যায়। অনেকেই টাকা পাঁচেকের পূজো দেন।

রাত্রে দোকানের রুটি জিলিপি দিয়ে জলযোগ করা হল। পাণ্ডাঠাকুর বাড়তি লেপের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাঁদের কম্বল ছিল তাঁরা একখানা করে লেপ নিলেন। আমাদের নিজেদের লেপেই কাজ চলে গেল। শীত এমন বেশি মনে হল না।

খুব ভোরে উঠে চা-সাহেব আর আমি বেড়াতে বেরোলাম।

বাজারের কাছে একটা ফাঁক দিয়ে নীলকণ্ঠ পর্বতের শ্বেতশুভ্র চূড়া দেখতে পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠ পর্বতের গায়ে কেদারের মন্দির। লোকে বলে এখান থেকে নীলকণ্ঠ পর্বতের সোজাসুজি দূরত্ব মাইল ত্রিশের বেশি হবে না। জনশ্রুতি এইরূপ যে অনেককাল আগে দুই পর্বত পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল না, গায়ে গায়ে লাগালাগি ছিল। তখন দুই মন্দিরের দূরত্ব এত কম ছিল যে একই পূজারী প্রত্যহ দুই মন্দিরের পূজা-অর্চনা করত। একদিন পুরোহিতের ত্রুটি হয়। এক মন্দিরের পূজো সারার পর আর এক মন্দিরে পূজো করতে যাবার আগে সে কিছু জলযোগ করে নেয়। সেই দিন দুই পাহাড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর সেই থেকে বিধান হয় এক পূজারী দুই জায়গায় পূজো করতে পারবে না।

কিংবদন্তি সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, নারায়ণ পর্বতের কোলে দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠ পর্বতের চূড়ো দেখবো এই ইচ্ছে নিয়ে অত ভোরে বেরিয়েছিলাম। ভোরে আকাশ একটু পরিষ্কার থাকার কথা। কিন্তু, আমাদের দুরদৃষ্ট, আকাশে মেঘ। নীলকণ্ঠ আর দেখা দিলেন না। এদিক সেদিক একটু ঘুরে চা খাবার জন্য বাসায় ফিরে গেলাম। তখন সকলে উঠে পড়েছেন। নিচেই চা-এর দোকান। আমাদের সেদিন পূজো দিতে যাবার কথা। মেয়েরা সেই জন্য কিছুই খেতে রাজি হলেন না। আমরা গরম চা খেয়ে নিলাম। এদিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। তারই ভিতরে এক দল উপরে আরও কিছু দূর ওঠা যায় কিনা দেখবার জন্য বেরিয়ে গেলেন।

সকলে ফিরে এলে তপ্তকুণ্ডে স্নান সেরে মন্দিরে যাবার জন্য তৈরি হলাম। পাকা-ভোগের তো ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া শুকনো মেওয়া, মিছরি, কিশমিশ, নারকোল, ডাল ও আরও সব শুকনো রকমের জিনিস জোগাড় করা হয়েছে, ভোগ দিয়ে দেশে প্রসাদ নিয়ে যাবার জন্য। পূজোর আনুষঙ্গিক মাঙ্গলিক দ্রব্যাদিরও ব্যবস্থা মেয়েরা করিয়ে রেখেছেন।

ঢঙ, ঢঙ, ঢঙ। মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। সামনের দরজার দিকে না গিয়ে মন্দির-কমিটির লোকের সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে মন্দিরে গিয়ে ঢুকলাম। আগেই বলেছি দেরাছুনের ডাক্তার সোমের নামে পথে সর্বত্রই কিছু না কিছু খাতির পেয়ে এসেছি। এখানেও কমিটির লোকজনের কাছে সোমের বেশ খাতির। সোমের স্ত্রী আবার এই তীর্থযাত্রায় আমাদের সঙ্গী। কাজেই গর্ভগৃহের দরজার সামনে ছুই পাশের বেদীতে কর্মকর্তাদের পাশেই আমাদের বসার একটু জায়গা হল। বেশ জায়গা। সেখান থেকে দেববিগ্রহ খুব স্পষ্ট দেখা যায়।

সামনের ঘর লোকে ভরে গেছে। স্বল্পপরিসর জায়গায় সর্ব-ভারতের নরনারী ঠেসাঠেসি, গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। পূজো আরম্ভ হবার এখনও অনেক দেরি। রাত্রিবেশ দূর করে ঠাকুরকে স্নান করানো হবে, সাজ সজ্জা আভরণে ভূষিত করা হবে। তার পরে পূজো। এর এক একটা পর্বেই অনেক সময় লাগে। প্রত্যেকটিরই খুঁটিনাটি নিয়ম কানুন আছে, পূর্বাপরের সুনির্দিষ্ট পারম্পর্য আছে। কোনটি আগে হবে কোনটি পরে হবে, কে কোনটা করবে, কতক্ষণ সময় ধরে কোন কাজটা করা হবে, কি রকম ভাবে করতে হবে, দীর্ঘকাল ধরে করে করে এ সকলেরই চিরাচরিত একটা বাঁধাধরা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে। সে নিয়মের এক চুল এদিক ওদিক হবার জো নাই। অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে পর পর সবই হয়ে চলেছে। ঠাকুরের কাছে রাওল বা প্রধান পূজারী, সঙ্গে ছুজন সহকারী রাওলকে সাহায্য করছে। গর্ভগৃহের দরজার বাইরে দেওয়ালের লাগোয়া বেদীতে রাওলের প্রতিনিধি তীর্থযাত্রীদের কাছে দেবমূর্তির ব্যাখ্যা করছেন ও পরিচয় দিচ্ছেন।

ঠাকুরের চন্দনের আবরণ উন্মোচন করা হল। তুলসীর মালা ও বনফুলের মালা সরিয়ে ফেলা হল। বস্ত্র আভরণ সব খুলে রাখা হল। খুব কাছে থেকে খুব স্পষ্টভাবে ঠাকুরের নিরাবরণ শিলামূর্তি অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেলাম। প্রায় ফুট তিনেক উঁচু একখানি কৃষ্ণ প্রস্তরের মধ্যে বদরীনারায়ণের দ্বিভুজ মূর্তি খোদাই করা। সমগ্র মূর্তিটিই অস্পষ্ট ধরনের। কালের আকর্ষণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব লেপে পুছে একাকার হয়ে গেছে। কোন অঙ্গই বিশেষ স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নাই। কোন কালে মূর্তিটি যে চতুর্ভুজ ছিল তা এখন মনে করা কঠিন। দুটি ভুজও ঠিক অক্ষত অবস্থায় নাই। একটিকে আধভাঙ্গার মত মনে হল। নাক মুখ চোখ প্রায় একাকার হয়ে গেছে। নাকটিও একটু ভাঙ্গা মনে হল। এঁকেই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি বলে ধারণা করে নিতে হয়। আচার্য শঙ্কর যখন এই মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন তখন চতুর্ভুজ নারায়ণ হিসাবেই এঁর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তির ধ্যান করে তিনি কুণ্ড থেকে এই মূর্তির উদ্ধার করেন। দ্বিভুজ মূর্তি দেখে প্রথমবার না কি তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি শিলাখণ্ডকে কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করে পুনরায় ধ্যানে বসেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সেবারেও তিনি এই মূর্তিই প্রাপ্ত হন। তখন এঁকেই তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বদরীনারায়ণের শিলা-বিগ্রহের আশে পাশে লক্ষ্মী, গণেশ, নারদ ও আরও অনেক দেবতার মূর্তি। বেশির ভাগই ধাতু-বিগ্রহ। বদরীনারায়ণেরও ধাতু-বিগ্রহ রয়েছে। শীতের আগে প্রতিনিধি-স্বরূপে এই ধাতু-বিগ্রহকেই জোশিমঠে নিয়ে যাওয়া হয়। মূল শিলা-বিগ্রহকে স্থানচ্যুত করানো হয় না।

পূজা

ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে ঠাকুরদের স্নান করানো হল। অঙ্গমার্জনা ও অঙ্গরাগ হল। মুল বিগ্রহকে চন্দনচর্চিত করা হল। অলঙ্কার পরানো হল। স্বর্ণছত্রশোভিত ঠাকুর আবার শোভায় সৌন্দর্যে, আলোয় ঝলমল করে উঠলেন। এবারে আসল পূজো আরম্ভ হবে। হঠাৎ রাওলের প্রতিনিধি, আমাকে এক পাশে ডেকে নিলেন।

নিচু গলায় বিনয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে আমাকে যা বললেন তাতে বোঝা গেল, ঠিক পূজোর সময়টিতে চা-সাহেবকে তাঁরা ওখানে থাকতে দিতে পারেন না। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম চা-সাহেব অতিশয় সজ্জন ও ভক্তিপরায়ণ লোক, তাঁকে পূজো দেখতে দেওয়ায় অন্যায় কিছু হতে পারে না। কিন্তু তাঁকে টলানো গেল না। বললেন তিনি নিরুপায়। আগে ইয়োরোপীয়েরা অনেকে এখানে ঠাকুর দেখতে এসেছেন। তার মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্মও গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দাবি ও পারিপার্শ্বিক সকল দিক বিবেচনা করে মন্দির-কমিটি নিয়ম করে দিয়েছেন যে পূজোর সময় বিদেশী কোন লোককে মন্দিরের ভেতরে থাকতে দেওয়া হবে না। সারা ভারতের লোক এখানে আসে এবং মন্দির-কমিটি তাদের প্রতিনিধি স্থানীয়। সমগ্র ভারতের বিদ্বজ্জনসমাজের সঙ্গে আলোচনা না করে মন্দির-কমিটি হঠাৎ এ নিয়ম পালটাতে পারেন না, আর মন্দির-কমিটির কর্মচারী হিসাবে তাঁরাও এ নিয়ম ভাঙ্গতে পারেন না।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কি আর করি, চা-সাহেবকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে হল। খুব ভাল লোক, ভাল ভাবেই কথাটা নিলেন। বললেন, দ্বারকার মন্দিরেও এই আপত্তি উঠেছিল।

তা কি আর হবে, ঠাকুর দেখা তো হয়েছে। পূজোর সময়টা মালা নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে কাটানো যাবে।

তিনি বাইরে চলে গেলেন। আমাদের মনটা খচ-খচ করতে লাগল। পূজো দেখলাম, কিন্তু অনেকখানি আনন্দ কমে গেল।

নানা উপচারে নানান রকমে অনেকক্ষণ ধরে পূজো হল। ধূপ, দীপ, গন্ধ, অর্ঘ্য, তুলসী, গব্য, সোনা, রূপো—কিছুরই অভাব নাই। কেবল পুষ্পেরই সমারোহের অভাব। এ সময়ে এখানে ফুল ফোটে না। পাহাড়ের গা ঘাসের মত ছোট ছোট গাছে একেবারে ছেয়ে থাকে, তারই খুব ছোট ছোট বেগুনি রঙের ফুল। সেই ফুলেই পূজো হয়। জোশিমঠের মন্দিরের বাগান থেকে গোলাপ ও অন্য রকমের ফুলও বোধ হয় কিছু কিছু আসে, তবে নিয়মিত আসে কিনা এবং এ সময়ে নিয়মিত পাওয়া যায় কি না বলা কঠিন।

ঠাকুরের দিকে মুখ করে পূজো দেখছি। পেছনে ঠাকুরের সামনের ঘরে যাত্রীদের ভিড়। ছোট ঘর। সকলকে একসঙ্গে ধরে না। যাত্রীরা সদর দরজা দিয়ে ঢুকছে, কিছুক্ষণ পূজো দেখছে, আবার পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু বেশিক্ষণ ধরে যে পূজো দেখবে তার জো নাই। অন্য লোকের তাড়া, পেছনের ধাক্কা। বেশি দেরি করলে চাপা পড়ার সম্ভাবনা। একটু নিরালায় দাঁড়াবার সুযোগ নাই। একটা প্রবহমান স্রোত। তার সঙ্গে ঢুকলে তারই সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হবে। এদিক ওদিক হবার জো নাই। আমরা একটু আড়ালে আছি, তাই বেশিক্ষণ ধরে পূজো দেখার সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু জনস্রোতের সঙ্গে যে যোগ সেও তো নারায়ণেরই সঙ্গে যোগ। সে যোগ থেকে কি আমরা বঞ্চিত হচ্ছি না? নাই বা জুটত বেশিক্ষণ ধরে পূজো দেখার সুযোগ, ঠাকুর দেখা তো হত! আর ঐ যে ভক্তিপরায়ণ চা-সাহেব, মালা জপতে জপতে যিনি সন্তুষ্ট চিত্তে মন্দির প্রদক্ষিণ করে চলেছেন, ঠাকুর কি

ওঁকে দেখা দেন নাই ? পূজো দেখা হল বটে কিন্তু মনটায় সোয়াস্তি হল না।

পূজোর পর আরতির দীপশিখার স্পর্শ নিয়ে চলে এলাম। এটি বোধ হয় দক্ষিণী নিয়ম! দক্ষিণের সর্বত্র মন্দিরে এই নিয়ম। উত্তরেও এ নিয়ম আছে কিন্তু সর্বত্র আছে বলে জানি না। বাঙলা দেশে এ নিয়ম কোথাও আছে বলে মনে পড়ে না। নিয়মটি সুন্দর। আরতির দীপশিখার স্পর্শ পেয়ে মনে হল যেন দেবতার প্রসাদ পেলাম।

বাইরে এসে দেখি চার পাশে ভজন-গান চলেছে। ছোট ছোট মণ্ডলীতে ভাগ হয়ে যাত্রীরা ভজন-গান করছে। কেউ কেউ বা একটু দূরে আলাদা হয়ে বসে ধ্যান করছে। চা-সাহেব আপন-মনে মন্দির প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। প্রসন্ন তাঁর মুখ।

পূজোর পরে ভোগ। ভোগের জন্য অন্তরালের দরকার। তখন দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভোগ দিতে সময় লাগে। তাই প্রসাদ-বিতরণেও দেরি হয়। দুপুরে অনেক বেলায় প্রসাদ এল। জগন্নাথের কণিকাপ্রসাদের মত মিষ্টি ঘি-ভাত, পায়েস, মালপো, আরও অনেক কিছু। দেশে নিয়ে যাবার জন্য পেলাম শুকনো মেওয়া-প্রসাদ, ঠাকুরের গায়ের চন্দন, তুলসীপাতার ও ছোট ছোট বেগুনি ফুলের মালা।

বিদায়

প্রসাদে পরিতৃপ্ত হয়ে বিশ্রামে মন দেওয়া গেল। বিশ্রামান্তে বেড়াতে বের হলাম। কিছু কেনাকাটা হল। বদরীনারায়ণের তামার পট ও ছবি। তিব্বতী ও পাহাড়ি মেয়েদের গয়নাও কিছু কেনা হল। তারপর নদী পার হয়ে ও-পারটা দেখতে গেলাম।

সাধুদের কিছু কুটির আছে কিন্তু সাধুদর্শন হল না। পাথরের গায়ে স্বাভাবিক ভাবে একটা বড় চোখ কি করে তৈরি হয়েছে। তার নাম দিয়েছে এরা শেষনেত্র। কয়েকটা নিচু জায়গা পুকুরের মত জলে ভরে রয়েছে। বেশ বড় সরোবরের মত। পাহাড়ের গায়ে কোথাও পুকুর খোঁড়ার উপায় নাই। তাই পাহাড়-অঞ্চলে কোথাও পুকুর দেখা যায় না। আমরা বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলের লোক। আমাদের পুষ্করিণী-বিলাসী বললে বেশি বলা হয় না। এখানে স্বাভাবিক পুকুর দেখে দেশের কথা মনে পড়ল। খুব আনন্দ হল।

১৯শে মে-র ভোরবেলা। খুব ভোরে উঠে চা-সাহেব, সুধীরবাবু ও আমি আর একবার নীলকণ্ঠ পর্বতের সন্ধানে বাজারের দিকে গেলাম। এখানে দাঁড়িয়ে যদি কেদারের পাহাড় না দেখা গেল তা হলে আর কি হল! আকাশে মেঘ ছিল না। বাজারের একটা ফাঁক দিয়ে নীলকণ্ঠ পর্বতের মাথা দেখা গেল। কি চমৎকার শোভা! প্রথমে মনে হল যেন আকাশের ঘন নীলের সঙ্গে মিশে রয়েছে। তার পরে একটু একটু করে সূর্যের আলো পড়তে লাগল। পাহাড়ের মাথায় সোনার একটু আমেজ লাগল। একটু পরেই তুষার-শীর্ষ রৌদ্রতেজে রূপোর মত ঝকঝক করে উঠল। পর মূহূর্তেই সমস্তটা আবার মেঘে ঢেকে গেল। উদ্দেশে কেদারনাথকে প্রণাম করে ফিরে এলাম।

আজই আমাদের ফিরে যাওয়া। চা-টা খেয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হলাম। পাণ্ডাজীর কাছে সুফল নিয়ে আমরা রওনা হলাম। বাজার পার হয়ে ঋষিগঙ্গার তুষারস্তূপ পার হয়ে চললাম। তুষারস্তূপের নিচেটা এখন গলতে আরম্ভ করেছে। যাত্রীদের সতর্ক করে দেবার জন্য বিপদের জায়গায় সেপাই মোতায়েন করা হয়েছে। সরু রাস্তা দিয়ে ভেড়ার পালের সঙ্গে তুষারক্ষেত্র পার হয়ে পুলের ওপর দিয়ে অলকনন্দা পার হলাম।

পেছন ফিরে বদরীপুরীর কাছে শেষ বিদায় নিলাম। আর এই

দূরযাত্রায় আমাদের আসা হয় তো হয়ে উঠবে না। বদরীনারায়ণ আমাদের এতদিনকার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। তাঁকে নমস্কার, বিশাল হিমগিরিকে নমস্কার, পুণ্যতোয়া অলকনন্দাকে নমস্কার। নমো নমস্তেঽস্তু, নমো নমস্তেঽস্তু................।

কল্পনা ও অনুমান

বেশ বেলা হয়ে গেছে। দেবদেখনার পথে ধীরে ধীরে উঠছি, আর বদরীনারায়ণের কথা মনে করছি। কোথাকার এই মূর্তি? কত প্রাচীন এর কাল? কত যুগের স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে? কোন সে মানুষ যারা প্রথমে এখানে পূজো দিয়েছিল? কারা তারা? তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, পরিবেশ, তাদের উপলব্ধির গভীরতা, কর্মের পরিধি কি ছিল? এই মূর্তিই কি এখানকার আদি, না, এর আগে আর কোন প্রতীক এখানে ছিল?

আচার্য শঙ্কর এই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তির উদ্ধার করেন। তার অনেক আগে মহাভারতের যুগেও বদরীনারায়ণ তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে একে তীর্থচূড়ামণি বলা হয়েছে। তীর্থ পর্যটনের ইতিহাসে সে যুগে এর মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই এ কথা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, মহাভারতের যুগের অনেক আগে থেকেই বদরীনারায়ণ তীর্থের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে হয়েছে? কারা করেছে? কি নিয়ে এর সূত্রপাত? চতুভুজ-মূর্তিই কি বরাবরের, না, আগে অন্য কোন মূর্তি এখানে ছিল?

এখানে কিংবদন্তি আছে, বৌদ্ধদের আক্রমণে এই মূর্তিকে কুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। এ কথা ঠিক হলে অনুমান করে নিতে হয় যে, বৌদ্ধদের আগে এখানে এই মূর্তিরই পূজো হত।

মাঝখানে বৌদ্ধযুগে অন্য কোন ব্যবস্থার পত্তন করা হয় এবং শঙ্করাচার্য পুনরায় পুরোনো আর্য-হিন্দু-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ধর্মাধিকারী মূর্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, তিব্বতী বৌদ্ধেরা এখনও এই মূর্তিকে বুদ্ধমূর্তি বলে কল্পনা করে ও সেই হিসেবে এখানে পূজোও দিয়ে থাকে। তা হলে এমন কি হতে পারে যে, বৌদ্ধ আমলেও বুদ্ধমূর্তি হিসেবে এই মূর্তিরই এখানে পূজো হত, শঙ্কর সেই মূর্তিকেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন ?

আর একটি প্রশ্নও এই সঙ্গে এসে পড়ে। বৌদ্ধেরা কি এখানে তাদের নতুন মূর্তির প্রতিষ্ঠা করে, না, পুরোনো আর্য-আমলের মূর্তিকেই তারা গ্রহণ করে এবং বুদ্ধমূর্তি বলে চালিয়ে দেয় ? পুরোনো মূর্তিই যদি চলে এসে থাকে তা হলে আর্য আমলের পৌরাণিক যুগের সঙ্গে এখনকার কালের একটা ধারাবাহিকতা প্রমাণ হয়। কিন্তু বৌদ্ধ আমলে যদি মূর্তির বদল হয়ে থাকে তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আগেকার মূর্তি কোথায় গেল। এখনকার মূর্তিই কি বৌদ্ধদের মূর্তি, পৌরাণিক যুগের পুরোনো মূর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, না, এইটিই পৌরাণিক যুগের মূর্তি, বৌদ্ধদের মূর্তি নষ্ট হয়ে গেছে ?

এখানে প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বিচার করা দরকার। বৌদ্ধদের আগে আর্য-হিন্দুদের আমল। কিন্তু তাদেরও আগে একটা পাহাড়ি আমল ছিল। সেই পাহাড়ি আমল থেকেই কি এখানকার তীর্থমাহাত্ম্য চলে এসেছে ? আর্যেরা কি সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোনো জিনিসকেই শোধিত ও সংস্কৃত করে মেনে নিয়েছিল ? অথবা, এমনও হতে পারে যে, পাহাড়ি আমলে এখানে কোন কিছুই ছিল না। আর্য-ঋষিরা পাহাড় ও বনের নির্জন অঞ্চলে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যের মধ্যে একান্তে তপস্যা করতে যেতেন। কালক্রমে সেই তপস্যার স্থানই তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করে ও এখানে সেই রকম করেই প্রথমে পুজো-আচ্চার সূত্রপাত হয় ?

আর একটা অনুমানও করা যেতে পারে। বদরীনারায়ণের একটু উপরেই মানা গিরিসঙ্কট। একটা গিরিপথ এই সঙ্কটের ভিতর দিয়ে গিয়ে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ করে দিয়েছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে, আর্যদের আমলের আগে থেকে, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সম্ভবত এই পথে লোক এসেছে আর গিয়েছে, এই পথে পাহাড়ি লোকেদের চলাচল, লেনদেন, কার-কারবার চলে এসেছে। দুর্গম এই পথ তখন নিশ্চিত দুর্গমতর ছিল। পথ ছিল দুর্গম, চলা-চলতি ছিল বিপদসঙ্কুল, চলার তাল ছিল দীর্ঘ ও বিলম্বিত। যাতায়াতের পথে গিরি-সঙ্কটটি ছিল সব চাইতে বিপজ্জনক জায়গা। তাই এ কথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, যাওয়ার পথে একবার, আর আসার পথে একবার, এ-পার আর ও-পারের পাহাড়িরা এই সঙ্কটের কাছাকাছি কোথাও দেবতার কাছে পূজো দিয়ে যেত।

কল্পনা ও অনুমান ছাড়া ইতিহাসে এর কোন পরিচয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক কালে এখানে এ রকম কোন পূজো দেবার ব্যবস্থা ছিল কি না, আর পাহাড়িদের সেই দেবতার চেহারা ও পূজো-পদ্ধতিই বা কি রকম ছিল এ বিষয়েও কোন কিছু নির্ধারণ করা আজ আর সম্ভব নয়। কিন্তু অতি-প্রাকৃতিক অতীন্দ্রিয় শক্তির, বুদ্ধিগত না হোক, হৃদয়গত সহজবোধ ও স্বীকৃতি, কোনও কালের একচেটে নয়। এ কালেও যেমন লোকের হৃদয়ে সে রকমের বোধ আছে আদিম কালেও তেমনই লোকের মনে, হয় তো কিছু অস্পষ্ট কিন্তু বেশ জোরালো ভাবেই, সে রকমের বোধ ছিল। কাজেই যে রকমেরই হোক না, পূজো দেবার ব্যবস্থা একটা ছিলই এ কথা সহজেই ধরে নেওয়া যায়।

সে পূজো কি রকম ছিল তা' জানি না, কিন্তু পরবর্তী যুগের পূজোর সঙ্গে সে পূজোও যে মিশে আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই মেশামেশি শুধু যে দেবমূর্তির বেলাতেই হয়েছে তা নয়,

দেবমূর্তির পেছনে যে সংস্কার, বিশ্বাস, দেব-ভাবনা, ধারণা ও প্রকাশ আছে সে সকলেরই মেশামেশি হয়ে গেছে। আজকের যে ভাবনা ও প্রকাশকে আমরা বিশেষ করে আজকের বলে মনে করছি তার মধ্যে আদিম কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সকল মানুষেরই দান আছে। কার দান কতটা ও কি তার পরিচয় আজ তা ঠিক ঠিক নিরূপণ করা কঠিন। তার স্তর ভাগ হয় তো কিছুটা করা যায়, কিন্তু সমগ্র কালের পরিমাপে সে নেহাতই আধুনিক সময়ের। পিতৃপূজা, দেবীপূজা, শিব ও বিষ্ণু, পৌরাণিক কথা, রামায়ণের কাহিনী ও মহাভারতের কাহিনী, সকলই এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। কোনটা কোন স্তরের, কোনটা কাদের বা কোন সময়ের দান সেটাই ঠিক করা মুশকিল।

স্মরণাতীত কালের সেই অন্তরের স্পর্শ, বহুযুগের ওপারের সেই বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহদের সাধনা ও দান কি আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করল? মানবের হৃদয় থেকে স্বত-উৎসারিত সংস্কৃতির প্রবাহ কি অলকনন্দার শুভ্র ধারা বেয়ে আমাদের শুচিস্নাত পাবন করে দিলে? আমাদের কালের ভাবনার ধারাও কি আমরা ভাবীকালের অনাগতদের জন্য কিছু রেখে গেলাম? তাদের আমলে এই প্রবাহ কি রকমের রূপ নেবে? সেই নতুন রূপের মধ্যে আমাদেরও কিছু দান, কিছু স্পর্শ থাকবে কি?

কালে কালে, দেশে দেশে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মানবজাতির এমন কি সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির, অচেতনের মধ্যে চেতনকে ফুটিয়ে তোলবার যে সমগ্র ও অখণ্ড সাধনা চলেছে, জীবে জীবেও তার প্রকাশ বিভিন্ন, অথচ সেই ভেদের দ্বারা সে সাধনা খণ্ডিত হয় নাই, তা সমৃদ্ধ হয়েছে। সে সাধনা এক অথচ বহুধা তার প্রকাশ। কোন সে সমৃদ্ধতম পরিণতি যে পথে সে সকলকে নিয়ে চলেছে? সে নিশ্চয়ই একটা নিরবচ্ছিন্ন সমগ্রতা—কিন্তু সে সমগ্রতা কি তার অন্তরে খণ্ড-প্রকাশের, খণ্ড-চেষ্টার মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে

রাখবে ? তার উজ্জ্বল আলোয় সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিভিন্ন চেষ্টার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ ও পরিচয়ও কি যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, না, ক্ষীণ আলো যেমন করে আত্মসমর্পণ করে তীব্র, উজ্জ্বল আলোর মধ্যে, তেমনই করে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে ? কার কতটুকু দান, কোন দানের প্রকৃতি কি, কোনও দিন কি সে কথা জানতে পারা যাবে ?

ঝড়

যাবে কি না জানি না, কিন্তু আগে তো তাল সামলাই! হঠাৎ দেখছি, হুড় হুড় করে কেবলই নেমে চলেছি। চলার সঙ্গে সঙ্গে অধোগতির বেগ ক্রমে বেড়েই চলেছে। রাস্তার সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হয়ে উঠল। শরীরটা ছুটে নামতে চায়। লাঠির ঠেকা দিয়ে আর পায়ের পাতার সাহায্যে শরীরের গতিবেগ কমিয়ে ভারকেন্দ্র ঠিক রাখতে হল। তাতে করে চলা কঠিন হল। মনে করেছিলাম ফেরার পথে শীঘ্রই নেমে যেতে পারবো, ওঠার চাইতে নামাটা সহজ হবে, কিন্তু দেখলাম, নামাটাও সহজ ব্যাপার নয়। লাঠি ও পায়ের পাতা দিয়ে ধাবমান শরীরকে সংযত করতে রীতিমত বেগ পেতে হল। পায়ের আঙুলের কাছে ও গোড়ালিতে ব্যথা করতে লাগল। গতি মন্থর হয়ে এল। অথচ দেখছি আশপাশ দিয়ে পাহাড়িরা কত সহজেই না চলেছে। তারা আমাদের অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। লক্ষ্য করে দেখি অল্প অল্প দৌড়ে দৌড়ে চলেছে। শরীরকে মোটেই ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে না। সুধীরবাবু ও আমি তাদের বিদ্যেটা আয়ত্ত করে নেবার চেষ্টা করলাম। অল্প অল্প দৌড়ে চলতে লাগলাম। তাতে নামাটা সহজ হল। যে বাড়তি শ্রমটা পায়ের পাতাকে করতে হচ্ছিল সেটা

সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হল, অথচ কোন একটা জায়গায় বেশি জোর পড়ল না। রাস্তায় তুষারক্ষেত্রগুলিতে তুষার গলতে আরম্ভ করেছে। বরফের গুহাটি এখনও আছে বটে, তবে ওপরের ঘেরটা অনেক পাতলা হয়ে এসেছে।

অনেক কম সময়ে হনুমান চটিতে এসে পৌঁছোলাম। স্নান, আহার ও অল্প বিশ্রামের পরই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বৈকাল নাগাদ লাম্‌বাগড় পৌঁছোলাম। তখনও কিছু বেলা আছে। একে ঘরমুখো মন, তাতে আবার নামাল পথ। কাজেই ঠিক হল একেবারে পাণ্ডুকেশ্বর গিয়ে রাত কাটানো যাবে। মেয়েরা আগে বেরিয়ে গেলেন। সুধীরবাবু, চা-সাহেব, বুদ্ধিরাম আর আমি একটু পরে বেরোলাম। সামনেই বাঁক, মেয়েরা আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। আমরা রাস্তায়, বাঁক তখনও পেরোতে পারি নি। একটু একটু মেঘলা ছিল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠল। হাওয়ার এমন প্রচণ্ড বেগ আগে কখনও উপলব্ধি করি নি। স্বল্পপরিসর রাস্তা। চা-সাহেব ছিলেন রাস্তার খাদের দিকের প্রান্তসীমায়। দেখি তিনি পড়তে পড়তে কোন রকমে বেঁচে গেলেন। চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, শীগগির সরে আসুন, পাহাড়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন। এদিকে চেয়ে দেখি, বুদ্ধিরাম ততক্ষণ পাহাড়ে পিঠ দিয়ে বসে পড়েছে। আমরাও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বসে পড়লাম। ঝড় প্রচণ্ডবেগে বয়ে চলেছে। একটা মাঝারি আকারের পাথর ওপর থেকে স্থানচ্যুত হয়ে আমাদের সামনেই একটু দূরে এসে পড়ল। তার পরেই দেখি, বলা নেই কওয়া নেই, বুদ্ধিরাম হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারলে। কিছু ভাবার সময়ই পেলাম না। দেখাদেখি আমরাও উঠে দৌড় দিলাম। পাহাড় ছাড়ি নাই। প্রায় পাহাড় ধরে ধরে দৌড় আর কি! মিনিট দশেক দৌড়েই দেখি বাঁকটা ঘুরে এসেছি। বাস, আর ঝড় নাই, হাওয়ামাত্রই নাই বললেই চলে। চারদিক

শান্ত, স্তব্ধ। তখন কে বলবে, এই পাহাড়েরই অন্যদিকে এক প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে। মেয়েদের কি হল, কে জানে! এতক্ষণ কারু কথাই ভাববার অবসর ছিল না। একমাত্র বাঁচার ইচ্ছাটাই যে ব্যক্তির মধ্যে থেকে একান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই কাজ করছিল তাও বুঝতে পারি নাই। এত ক্ষণে ধীরে সুস্থে আগের দলের সম্বন্ধে মনে উদ্বেগ হল। অনেকগুলি মেয়ে, তাদের না জানি কি হল!

পা চালিয়ে চললাম। বরাবর নামাল পথ। পাণ্ডুকেশ্বরের মাইল দেড়েক আগে রাস্তার ঢালটা সহজ হয়ে এল। সেখানে এসে আগের দলের দেখা মিলল। শুনলাম, তাঁরা ঝড় পান নাই।

রাস্তা বরাবর নদীর ধারে ধারে চলেছে। নদী যেন সমতলে চলেছে। সন্ধ্যার মুখ। অন্ধকার তখনও পুরোপুরি নামে নাই। শান্ত নদী। আশেপাশে যাত্রী চলেছে, সবাই ফিরতি পথে। শান্ত, স্তব্ধ, পরিবেশ স্নিগ্ধ মাধুর্যমণ্ডিত। আমাদের বাঁয়ে নদী, ডান দিকে ছোট ছোট চাষের খেত। কোন কোন খেতে মেয়ে-পুরুষে তখনও কাজ করছে। এক জোড়া ছোট গরু ও একটা ছোট লাঙল দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় এই কেবলমাত্র কাজ শেষ করেছে। এইবারে বাড়ি ফেরার পালা। চার দিক ছেয়ে অন্ধকার নেমে এল। স্বল্প অন্ধকারের মধ্যে পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছে গেলাম। নতুন কিছু দেখার নাই। চা খেয়ে খানকয়েক চিঠি লেখা গেল।

২০শে মে সকালে পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘাট, বলদেও পার হয়ে প্রায় এগারোটায় বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছলাম। বিষ্ণুপ্রয়াগ ছোট জায়গা। চটিও বেশি নাই। দু মাইল দূরেই জোশিমঠ। সেখানে গিয়েই আজ আড্ডা নেবার কথা ছিল। কিন্তু বেলা হয়ে গেছে। সামনের দু মাইল একেবারে খাড়া চড়াই। প্রখর রোদে উঠতে আরও বেশি কষ্ট হবে। এই ভেবে মেয়েরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রামটা এখানেই সেরে নেবার ব্যবস্থা করেছেন।

রেণু আর সুশীলা আগেই পৌঁছেছিলেন। কোথা থেকে নটে শাক আর কচি আম জোগাড় করেছেন। এ অঞ্চলে এখনও অর্থাৎ বর্ষার আগে কাঁচা শাক-তরকারি জোগাড় হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু মহামায়াদের অসাধ্য কিছুই নাই। নটে শাক, আলু ভাজা, মুগের ডাল, ভাত আর আমের অম্বল—দুপুরের ভোজটা পরিপাটি হল।

বেশ খানিকটা বিশ্রামের পর পড়ন্ত রোদে রওনা হলাম। দু মাইল খাড়া চড়াই। ওপরে জোশিমঠ দেখা যাচ্ছে। সেই তীক্ষ্ণ কোণের তির্যকগতির রাস্তা এধার-ওধার করে উপরে উঠে গেছে। দু মাইল উঠতে ঝাড়া দেড় ঘণ্টা লাগল, কি প্রায় দু ঘণ্টাই হবে। বৈকাল শেষ হবার আগেই জোশিমঠে পৌঁছে গেলাম। এখানকার চেনা লোকদের সঙ্গে দেখা হল। সেই কালি কমলিওয়ালার ধরমশালাতেই আশ্রয় নিলাম।

থানা-পুলিশ

এ কয় দিন চা-সাহেবকে নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেল, তার জের খানিকটা মিটল এসে এখানে। ঠিক ঠিক জায়গায় ঘটনাটা বলা হয় নাই। এখানেই সেটা শেষ করে নেওয়া ভাল। বদরীনাথ পার হয়ে মানা গিরিসঙ্কট। ঐ গিরিসঙ্কট এদেশ ও তিব্বতের, অর্থাৎ আজকার চীনদেশের সীমান্ত। তিব্বতের সীমান্ত চীনেদের দ্বারা সুরক্ষিত। এদেশেরও সীমান্ত সুরক্ষিত করা দরকার। এই নীতি অনুসারে সীমান্ত অঞ্চলে জায়গায় জায়গায় অস্থায়ী ও স্থায়ী ঘাটি ও ছাউনি করা হচ্ছে। আমরা পল্টন চলাচল করাও দেখলাম।

এদিককার সমগ্র সীমান্ত-অঞ্চলকে কতকগুলি বিপজ্জনক ঘাটির কল্পিত এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। কোথা থেকে একটা এলাকার

সীমান্তরেখার শুরু, কোথায় শেষ, ও কোথা থেকে আর একটার আরম্ভ বা কটা এলাকা আছে, এবং তারা বস্তুত আছে কি নেই, সে কথা সাধারণ যাত্রীরা জানে না, আমাদেরও জানা ছিল না। বদরীনাথ পৌঁছোবার পরই উর্দিবিহীন পুলিশ আমাদের জানিয়ে দিলে যে চা-সাহেবের পক্ষে অনুমতি না নিয়ে বদরীনাথ আসাতে বেআইনিভাবে অনেকগুলি ঘাটি-এলাকার সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে। তাদের কাছে কাগজপত্র চেয়ে নিয়ে দেখলাম, মাত্র অল্প কয়েক দিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে যে ঐ ঘাটিগুলি বিপজ্জনক এলাকা এবং গাড়োয়াল জেলার ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি না নিয়ে কোন বিদেশী, বিশেষ করে চীনে এবং নিয়মিত ব্যবসায়ী নয় এরূপ তিব্বতী, ঐ সকল এলাকায় ঢুকতে পারবে না। খুব অল্প দিনের ঘোষণা। আমাদের জানার কথাও নয়। কিন্তু দেখা গেল, আইন ঠিকই ভঙ্গ করা হয়েছে।

চা-সাহেব ভারত গভর্মেন্টের উচ্চ শিক্ষণালয়ে কাজ করেন। ঘোষণার কথা জানলে দিল্লি থেকে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে আসা কঠিন ছিল না। এ সকল কথা ওদের বলা হল, এবং যে অপরাধ আগেই ঘটে গেছে তার জন্য অনুমতি চেয়ে জেলার ডেপুটি কমিশনারের কাছে জরুরি তার করা হল। চা-সাহেবের কাছে দিল্লির শিক্ষণালয়ের অধ্যক্ষের দেওয়া একটা পরিচয়পত্র ছিল। তারই জোরে, এবং কতকটা ডাঃ সোমের পরিচয়ের খাতিরে পুলিশ এ ব্যবস্থায় রাজি হল। উর্দিবিহীন পুলিশের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ সোমের বিশেষ পরিচিত, বোধ হয় সহপাঠীই বা হবেন। উত্তরের-জন্য-আগাম-মূল্য-দেওয়া জরুরি তারের খরচাটা অবশ্য চা-সাহেবকেই দিতে হল।

দুদিন বাদে যখন বদরীনাথ ছেড়ে চলে আসি তখনও ডেপুটি কমিশনারের উত্তর এসে পৌঁছে নাই। পুলিশের অধ্যক্ষ বললেন, আপনারা রওনা হয়ে যান। উত্তর এলে আমি জরুরি লোক দিয়ে

পাঠিয়ে দেবো। তবে এর মধ্যে উত্তর না এলে চা-সাহেবকে জোশিমঠে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। জোশিমঠের থানায় আপনারা খবর নেবেন। বিষ্ণুপ্রয়াগে যখন আমরা খাওয়া দাওয়া করি তখন পুলিশের লোক এসে ডি. সি.-র তার দিয়ে গেল। তিনি ফেরার পথে চা-সাহেবকে পাওরিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছেন। জোশিমঠে গিয়ে সকলের আগে থানায় গেলাম। সেখানে তারটা দেখালাম। তাঁরা বললেন, তারের কথা তাঁরা জানেন। আমাদের চলে যাবার কোন বাধা নাই। এক বিপত্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম। বিদেশী লোক। তাঁকে ফেলে আমরা যেতেও পারতাম না। কাজেই আটকই থেকে যেতে হত।

পুরোনো বন্ধু

ধরমশালার সামনেই একটি বাচনালয় অর্থাৎ লাইব্রেরি। এবারে সেটা খোলাই পেলাম। হিন্দি খানকয়েক খবরের কাগজ আছে। উত্তর প্রদেশের দিন পাঁচ ছয় আগেকার একটা কাগজে বাঙলা-দেশের পুরোনো এক খবর পেলাম, কলকাতার আশে পাশে খুব ঝড় হয়ে গেছে। অল্প কিছু ঘরবাড়িও পড়েছে। খবরটা এমন কিছু নয়। ভাল খবর তো নয়ই। তবুও একমাত্র এই খবরটার ভিতর দিয়েই যেন দেশের একটা স্পর্শ পেলাম। দেশের কথা যেন অনেক শোনা হল। খবর যেখানে মোটেই নাই সেখানে এই সামান্য খবরটিই অপরূপ হয়ে হৃদয় স্পর্শ করল।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মাস্টার মশায়টির সঙ্গে দেখা হল। দু চারটি ছেলেমেয়েদেরও দেখলাম। মেয়েরা আর এক বার শঙ্করাচার্যের মঠ দেখতে গেলেন। আমরা চেনা দু এক জন লোকের সঙ্গে দেখাশোনা সেরে নিলাম। চা-টা খেয়ে ধরমশালায় ঢুকলাম।

পূরণচাঁদ খবর পায় নাই। তাই বোধ হয় তার দেখা নাই। নইলে হয় তো এক বার হবু-কনেকে দেখার জন্য কোন অছিলা করেও আসত। ভোর বেলা রুটি, তরকারি, বিস্কুট, চা খেয়ে জোশিমঠকে নমস্কার করে বেরিয়ে পড়লাম। বুদ্ধিরাম বুদ্ধি করে রাত্রের রুটি, তরকারি রেখে দিয়েছিল। তাই সকাল বেলার জলযোগের পর্বটা বেশ ভারি রকমেরই হল।

জোশিমঠ, সিংহধার পার হয়ে চললাম। নদী ডান দিকে একটু সরে গেছে। রাস্তার দু ধারে চটি, ঘরবাড়ি, ফলফুলের বাগান। বাঁয়ে রাওলদের বেশ বড় ফলের বাগান। নানা রকম পাহাড়ি ফলের গাছ। আপেল, প্লাম, পিচ ও আরও অনেক রকম ফলের গাছ। একবার ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম, রকমারি গাছ দেখবার জন্য। মালি আপত্তি করলে। বললে, যাত্রীরা গাছের উপর বড় উপদ্রব করে। তাই যাত্রীদের ঢুকতে দেওয়া বারণ।

সিংহধার ছাড়িয়ে গেলাম। লোক-বসতি বিরল হয়ে এল। ঝড়কুলায় আর এক বার চায়ের চেষ্টায় বসে গেলাম। এখানেই নদীর দুধারে সেই ধাপ-ধাপ চাষের জমি। ও-পারে উপর থেকে নদী পর্যন্ত ধাপে ধাপে নেমে গেছে। এ-পারে রাস্তা থেকে আরম্ভ করে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত ধাপে ধাপে উঠে গেছে। তাদের জায়গা করার জন্য পাহাড় যেন কোল মেলে দিয়ে ঢালু হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। উপরে উঠেছে আর মাথাটাকে ক্রমে সরিয়ে নিয়েছে। গোনা হল। দুধারের আলাদা আলাদা জমি দেড়শ পর্যন্ত গোনা গেল। আলগুলি যেন মোটা কালো রেখা দিয়ে জমিগুলিকে ভাগ করে দিয়েছে।

চা খাওয়া শেষ হতেই কলকাতার এক দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঢাকুরিয়ার ললিত চট্টোপাধ্যায় ও বেহালার কানাই চট্টোপাধ্যায় আর তাঁদের দুটি বন্ধু। সব কটিই কমবয়সী। রুদ্রপ্রয়াগে এঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। প্রচলিত রীতি

অনুসারে এঁরা সেখান থেকে কেদারের দিকে চলে যান। আমরা উলটো পথে বদরীর দিকে চলে আসি। তাঁরা কেদার সেরে বদরী যাচ্ছেন। তাই আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হল। কেদার একটু তাড়াতাড়িই সেরেছেন। বললেন, কেদারের চটি ভাল, আর রাস্তায় এদিককার চাইতে ধুলো কম। একটি নৃত্যশীল পাহাড়ি বালকের ফোটো নিলেন। আমাদের তিন বুড়োরও ছবি তুললেন। কিছুক্ষণ শিষ্টালাপের পর তাঁরাও বিদায় নিলেন। আমরাও রওনা হলাম।

কুমারকোট

ঝড়কুলা, খনোটি, পৈনি পার হয়ে হেলঙ বা কুমারকোটে এসে পৌঁছোলাম বেলা প্রায় দশটায়। দুপুরের খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম ওখানেই করা হবে ঠিক হল। মাঝারি বড় জায়গা। দোকান-পসার খুব বেশি নয়। তবে ডাকঘর, ধরমশালা ও সদাব্রত আছে। অনেকগুলি চটি। কিন্তু সেদিন দুপুরে যাত্রীর ভিড় দেখলাম না। কিছু দূরে কর্মনাশা নদীর সঙ্গম। আমাদের ঠিক নজরে পড়ে না। উঁচু-নিচু বেশি নাই, অনেকটা সমতল। আমরা চটিতে উঠলাম। সতরঞ্চি পাওয়া গেল। বিছানা আর খুলতে হল না।

দু জায়গায় দুটো মোটা মোটা নল দিয়ে উপর থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছে। সেই জলেই আমাদের স্নানপানের ব্যবস্থা। লোকের ভিড় বেশি নয়। স্নানের অসুবিধা হল না। কিছু কাপড়-চোপড়ও পরিষ্কার করে নেওয়া গেল। দেখি, এর মধ্যেই মেয়েরা ধনেশাক, পুদিনা, পেঁয়াজ ও ঢেকি শাক জোগাড় করেছেন। এ সময়ে এখানে কাঁচা সবজি এক অমূল্য বস্তু। বর্ষার পরে এখানে অনেক রকমের সবজি পাওয়া যায়। অনেক ফুলও পাহাড়ে

আপনি ফুটে থাকে। কিন্তু এখন তো বৃষ্টি নাই। তাই এগুলি দুষ্প্রাপ্য। তরকারির মধ্যে আলু ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এ সময়ে কোথাও কেমন দু এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। অথবা লোকজন উদযোগ করে পাহাড়ি জলধারা থেকে জল আনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা করেছে। তাই কোথাও কোথাও এই অসময়েও কিছু কিছু সবজি দেখা যাচ্ছে। নানা রকমের ছোট বড় ঢেকি শাক অবশ্য পাহাড়ের গায়ে আপনিই হয়ে থাকে। তার মধ্যে কতকগুলি আবার বিষাক্ত। গ্রামবাসীরা ওরই মধ্যে বেছে কিছু কিছু তুলে নিয়ে আসে ও যাত্রীদের কাছে বিক্রি করে। তাও কালেভদ্রে কদাচিৎ মেলে। শাক, আলুভাতে, ডাল, পেঁয়াজ-চচ্চড়ি ও পুদিনার চাটনি দিয়ে ভোজনপর্বটি পরিপাটি রকমে সমাধা হল। অনেকেই সতরঞ্চির উপর গা মেলে দিলেন।

পাহাড়ি মেয়ে

আমি খাম-পোস্টকার্ড নিয়ে কিছু দূরে এক গাছতলায় গিয়ে বসলাম। কিছু চিঠি লিখতে হবে। মাঝারি রকমের একটা গাছ। গোড়াটা উঁচু করে বাঁধানো। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। উপরে পাথর দিয়ে গোল করে বেঞ্চের মত করে দেওয়া আছে। হেলান দেবার ব্যবস্থা নাই, কিন্তু বসার পক্ষে বেশ প্রশস্ত। গাছটা বোধ হয় আপেল গাছ হবে। ছোট ছোট ফলও ধরে আছে। অবশ্য আপেল বলে এখনও চেনা যায় না। লোকেরা বললে গৌরীফলের গাছ। পাকলে, গৌরীফল তারা খায়। অনেকক্ষণ ধরে একমনে চিঠিপত্র লিখছি। অনেক চিঠি-লেখা জমা হয়ে ছিল। এখন সময় পেয়ে এখানকার বর্ণনা সকলকেই কিছু কিছু

লিখে পাঠাচ্ছি। এতক্ষণ খেয়াল করি নাই। হঠাৎ দেখি একটি অল্পবয়সী পাহাড়ী মেয়ে সেখানে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। ফরসা, একটু লম্বা ধরনের, পাহাড়িদের হিসেবে মুখচোখ বেশ ভালই। গাছতলায় এদিক সেদিক করে বেড়াচ্ছে, অথচ কোন কাজ আছে বলে মনে হল না। চোখে মুখে সরলতার ছাপ—পয়সা চায় বলেও মনে হল না। বিদেশী বুড়ো মানুষের বিষয়ে কৌতূহলও বিশেষ কিছু থাকার কথা নয়। নির্জন দুপুরে গাছতলায় এসে বসেছি। লেখার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। মনে পড়ল, অনেকক্ষণ ধরে ও এখানে ঘোরাঘুরি করছে। এতক্ষণ খেয়াল করি নাই। চোখ তুলে ওর মুখের দিকে চাইলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করবো কি না ইতস্তত করছি, কিন্তু মেয়েটি কাছে এসে বলল, আমি তোমার চিঠি লেখা দেখছি। তুমি কি সব লিখেছো, তোমার লেখা তো মোটেই ভাল নয়। আমি কিছুই পড়তে পারছি না। মনে মনে বোধ হয় একটা অহংকার ছিল। বন্ধুবান্ধবরা আমার হাতের লেখা মন্দ নয় বলেই বলে থাকেন। আর এ কি না অম্লান বদনে বলে দিলে আমার হাতের লেখা খুব বিশ্রী। আর তার প্রমাণ হল কি না সে পড়তে পারছে না। আমি বিনয় করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, হাতের লেখাটা আমার খারাপই বটে, কিন্তু তার তো সেটা পড়তে পারার কথা নয়, কারণ আমি বাঙ্গালী আর লেখাটা বাঙলা। অসহিষ্ণু হয়ে সে বলে উঠল, সে কথা সে জানে। বাঙলা লেখার কথা সে বলছে না ; সে ঠিকানার ইংরেজি লেখাটার কথা বলছে। হাত দিয়ে সে পোস্টকার্ডের ঠিকানা-লেখাটা দেখিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ইংরেজি লেখা পড়তে পারো ? সে বেশ একটু গর্বের সঙ্গে বললে, পারি। কথায় কথায় জানা গেল সে ওখানকারই এক চটিওয়ালার স্ত্রী। বেশ সম্পন্ন অবস্থা। কয়েক মাস তারা ওখানে চটির কারবার চালায় আর শিলাজতু ও নানারকমের পাহাড়ি জিনিস সংগ্রহ করে। বাকি কয়েক মাস

তারা দেশে চলে যায়। গাড়ওয়াল জেলারই সমতল জায়গায় তাদের বাস। সেখান থেকে তারা নানা জায়গায় শিলাজতু ও অন্যান্য নানা রকমের পাহাড়ি জিনিস চালান দেয়। সেই সব চালানে যে ইংরেজি ঠিকানা লেখা হয় তা সে বেশ পড়তে পারে, কিন্তু আমার চিঠির ইংরেজি লেখা সে পড়তে পারছে না। এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। চালানের ঠিকানা বড় বড় ব্লক-লেটারে লেখা হয়। সে অক্ষর তার চেনা। কিন্তু আমার লেখার অক্ষর তার চেনা নয়। তার যখন চেনা নয় তখন লেখাটা যে ঠিক হচ্ছে না সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! তার ভুল ঘোচানো আমার পক্ষে সম্ভব হল না। খানিকক্ষণ আলাপ করে সে চলে গেল। বেশ মেয়েটি। তার আত্মপ্রত্যয়, যুক্তিপ্রমাণ সম্বন্ধে তার নিঃসংশয় বোধ, সরলতা, মতামত প্রকাশের স্বচ্ছতা সবই বেশ ভাল লাগল। মনে হল আমরাও অনেক সময় ঐ রকমের যুক্তিপ্রমাণই প্রয়োগ করে থাকি। অথচ তার কতই না গালভরা ভারি ভারি নাম দিই। চিঠিলেখা আর হল না। পাততাড়ি গুটিয়ে চলে এলাম। একটু পরেই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুমারকোট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কুমারকোট থেকে অনেকখানি চড়াই ভেঙ্গে ও গোলাপকুঠি থেকে অনেকখানি উতরাই করে পাতালগঙ্গা। গোলাপকুঠিতে ডাকবাংলো আছে। অনেকগুলি চটিও আছে। গোলাপকুঠি থেকে তু মাইল দূরে পাতালগঙ্গা। সন্ধ্যার আগে সেখানে পৌঁছে গেলাম। আগেকার চটিওয়ালার কাছেই গেলাম। একুশে মে তারিখ সেখানেই রাত্রিবাস করা হল।

বাইশ তারিখ সকালে পাতালগঙ্গা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পাতালগঙ্গার কাছেই নরম পাথরের পাহাড়। অনবরত ধস নামছে, রাস্তা ধসে পড়ছে। উত্তর প্রদেশ গভর্মেণ্টের এক দল লোক সেখানে কাজে লেগেই আছে। তারা তখন তখনই রাস্তা মেরামত করছে। চলতি রকমের একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। পাকাপাকি রকমের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না বটে, কিন্তু যা হোক করে কাজ চলে যাচ্ছে। যাত্রীরা মাঝপথে আটক পড়ে থাকছে না। যাবার সময় রাস্তার খুব সঙ্কটজনক পরিস্থিতি দেখে গিয়েছিলাম। এরই মধ্যে দেখি তার অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। বাঁকের মুখে একটা ভয়ানক বিপজ্জনক কোণ ছিল। সেখানে শুধুহাতেই পার হওয়া মুশকিল ছিল, মোটমাটরি নিয়ে যাওয়া তো রীতিমত একটা সঙ্গিন ব্যাপার। এবার দেখি সেই কোণটাকে একেবারে মেরে দেওয়া হয়েছে। কোনখানে যে কোণটা ছিল তা ভাল করে ঠাওর করতে পারলাম না।

চড়াই-উতরাই করে টঙনি পার হয়ে গরুড়গঙ্গায় এলাম। নদীতে অল্প জল। নদীর মধ্যেই আবার পাথর দিয়ে ঘিরে একটা কুণ্ড তৈরি করা হয়েছে। দিব্য কাকচক্ষু জল। পরিষ্কার টলটল করছে। তলা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। জল স্পর্শ করে গরম গরম চা-জিলিপি খেয়ে এগিয়ে চললাম। দু তিন মাইল দূরেই পিপলকুঠি। বড় জায়গা, জলেরও বন্দোবস্ত ভাল। সেখানেই দুপুরের বিশ্রাম সেরে নেওয়া যাবে।

চেনা জায়গা। তা ছাড়া এক বেলাই থাকার ইচ্ছা। কালি-কমলিওয়ালার ধরমশালাতেই ওঠা হল। খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম

সেরে বৈকালে তলপি-তলপা নিয়ে ধরমশালা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এখানকার বাজার বেশ বড়। অনেকগুলো দোকান। সমতল ও পাহাড়ের জিনিসপত্রের বিচিত্র সমাবেশ। আমাদের বিশেষ কিছু কেনার ছিল না। চামরের বড় দোকান দেখে কারও কারও আরও দু একটা চামর কেনার সখ দেখা দিল। ভাল দেখে কয়েকটা চামর কেনা হল। কিছু ভূর্জপত্রও নেওয়া গেল। তখন আমরা চলতি পথে। ভারবাহীরা আগেই রওনা হয়ে গেছে।

আসার সময় পিপলকুঠির আগে প্রথম বড় চড়াই পেয়েছিলাম। বেলাও হয়ে গিয়েছিল বেশি। প্রখর রোদে অত বড় চড়াই ভাঙ্গতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। এবার ফিরতি পথ। আগেকার চড়াই এবার উতরাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈকালের পড়ন্ত রোদ। তাপ বেশি নয়। হুড়হুড় করে নেমে এলাম। এক টানে ধোবিঘাট পর্যন্ত। আমাদের রাস্তা ঘুরে ঘুরে নেমেছে। পাহাড়িরা পগদণ্ডি বেয়ে সোজাই নামছে। আমাদের আগেই তারা নেমে গেল। রাস্তা সংক্ষেপ করবার জন্য আমরাও দুটো একটা পগদণ্ডি ধরে নামার চেষ্টা করলাম। দেখলাম পগদণ্ডি বেয়ে ওঠা শ্রমসাধ্য ব্যাপার কিন্তু খুব বিপজ্জনক নয়। কিন্তু পগদণ্ডি বেয়ে নামাটা রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার। আছাড় খাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। আর একবার পা হড়কালে একেবারে অনেকটা নিচে গিয়ে পড়তে হবে। পগদণ্ডি দিয়ে নামা আমাদের ধাতে চলল না।

ধোবিঘাটের কাছে নদী পার হলাম। নদীর কাছাকাছি টুকরো টুকরো জমিতে জল সেচ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও সবজির আবাদ করা হয়েছে। ধোবিঘাট থেকে প্রশস্ত সমতল রাস্তা। পাশেই নদী সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। রাস্তায় দু ধারেই বড় বড় গাছ। নিমগাছই বেশি। অপরাহ্নের শান্ত মনোরম পরিবেশে দেশের মত সমতল রাস্তায় চলতে খুব আরাম বোধ হচ্ছিল। সিয়াসৈন বা সিয়া চটিতে এসে পৌঁছলাম, তখনও অন্ধকার নামে

নাই। আরও কিছু দূর এগিয়ে যাওয়া চলত, কিন্তু সিয়াসৈনের শান্ত পরিবেশ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি দেখে সকলেরই খুব পছন্দ হল। ঠিক হল সিয়াতে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন চমোলি যাওয়া যাবে। আজকে আর বেশি এগিয়ে থাকলে ভাগ্য কি বাড়বে!

ভাল করে চা-টা খেয়ে মৌজ করে আড্ডা জমানো গেল। রাত্রে ভূরিভোজ। সুশীলার ছেলে অন্তুর জন্মদিন। সে কাছে নেই। তাকে স্মরণ করে আজ ভূরি ভোজনের আয়োজন হয়েছে। আলুর পরোটা, চিঁড়ের পায়েস, আর লাড্ডু। লাড্ডুটা দোকানের, আর সব ঘরে তৈরি। বেঁচে থাক অন্তু। তার শ্রীবৃদ্ধি হোক। তারই দৌলতে তো এই দুর্গম পথে রীতিমত কষ্ট করে এই সকল মুখরোচক খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। এই পাহাড়ের পথে দৈনন্দিন খাবার ব্যাপারটা রোজই একরকমের ও একঘেয়ে। তার মধ্যে নূতনত্ব করা কঠিন। তাই নূতন জিনিস পেলে এখানে মনের উল্লাসও বেশি হয়।

২৩ তারিখ সকালে সিয়া থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজই চমোলি পৌঁছোনো যাবে। সকলেরই খুব উৎসাহ। সেখান থেকেই কিছু দিন আগে বদরীনাথ যাত্রা করেছিলাম। যাত্রারম্ভে ছিল উত্তেজনার আনন্দ, ছিল ভয় ভাবনা। অজানার আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ছিল জানা না থাকার জন্যই একটা ভয়। যাত্রাশেষে এসেছে একটা পরিতৃপ্তির শান্তি ও পরিচিত পরিবেশের আকর্ষণ। বাড়ি ফেরার উৎসাহ সকলকে পেয়ে বসেছে। তাই দূরত্বকে আজ আর দূরত্ব বলে মনেই হচ্ছে না। সকলেই যেন উড়ে চলেছি।

বিরহী ও অলকনন্দার সঙ্গম দূর থেকে দেখা গেল। সতী-বিরহী শিব এখানে সতীকে ফিরে পাওয়ার জন্য তপস্যা করেছিলেন। ছোট্ট পার্বত্য নদীটি নিজের নামের সঙ্গে সেই স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে। আমাদের রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূর। দুর্গম

জায়গা। যাবার রাস্তা নাই। তাই ওটি এখনও তীর্থে পরিণত হতে পারে নি। বেশ নিরিবিলি জায়গা।

বিরহী-সঙ্গম, বৌঁলা, ছিনকা, মঠ পার হয়ে চললাম। সবই পরিচিত জায়গা। ফেরার পথে সকলকেই আপনার জন বলে মনে হল। সকলেরই স্মৃতি মনের মধ্যে সঞ্চয় করে নিয়ে চলেছি। আর কোন দিন আসা হবে কি না কে জানে!

কেদারের টান

সকাল সকাল চমোলি পৌঁছে গেলাম। আমাদের রাস্তা সোজা তুঙ্গনাথ হয়ে উখিমঠের কাছে মন্দাকিনী পার হয়ে নালাচটিতে গিয়ে কেদারের রাস্তায় পড়েছে। ওপারে চমোলি শহর। ঝোলাপুল পার হয়ে শহরে এলাম। এসে দেখি চার দিকে লোক গিজগিজ করছে, তিলধারণের স্থান নাই। কালি কমলিওয়ালার ছটো ধরমশালা। একটাতেও জায়গা নাই। আশপাশের চটিতেও লোক ধরে না। রাস্তা ঘাট সকল জায়গাতেই অসম্ভব রকম লোকের ভিড়। মেয়েদের নিয়ে সুবোধ আগে এসেছে। তারাই বা কোথায় গেল?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাজার ছেড়ে উপরে উঠে গেলাম। খানিকটা উপরে উঠে দেখি অনেক উপর থেকে সুবোধ ডাকাডাকি করছে। কোথাও জায়গা না পেয়ে তারা এই উঁচুতে উঠে একটা ঘর ভাড়া করেছে। জলের বন্দোবস্ত নাই, পায়খানা নাই। সামনের বারান্দায় বসার জো নাই। আর একদল যাত্রী সেটা ভাড়া নিয়েছে। আমাদের কেবলমাত্র একটি ঘর। মাথাপিছু দিনে চার আনা ভাড়া।

বাস্-এর চেষ্টায় যাওয়া গেল। বাস্-রাস্তার এখানে ওখানে লটবহর নিয়ে যাত্রীরা বসে গেছে। কেউ বা একটু ছায়া দেখে

বিছানা বিছিয়ে নিয়েছে। টিকেট-অফিসের সামনে বিস্তর যাত্রীর ভিড়। অনেকেরই থাকার জায়গা নেই। যেখানে সেখানে খাওয়া ও রাস্তার উপরে উন্মুক্ত গগনতলে শয়ন। শুনলাম অনেক যাত্রী তিন চার দিন ধরে এই রকম ভাবে কাটাচ্ছে। রোজই কিছু কিছু খালি হয় আর তার চাইতেও বেশি যাত্রী এসে পড়ে। কাজেই জমার অঙ্ক ক্রমে বেড়েই চলেছে। টিকেট অফিসের লোকেরা বললেন, পর পর টিকেট রিজার্ভ করে রাখতে হবে, তবে তিন চার দিনের আগে বাস্-এ জায়গা পাওয়া যাবে না।

বিপদেই পড়া গেল। আগে ঠিক ছিল আমি চমোলি থেকেই ফিরবো, কেদার-দর্শনে আর যাবো না। যাঁদের সে ইচ্ছে হয় তাঁরা চমোলি থেকে বাস্-এ করে রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে নামবেন ও সেখান থেকে কেদার যাত্রা করবেন। মাঝখানে চমোলি থেকে নালাচটির বাড়তি পথটা আর হাঁটবেন না। এখন সবই উলটে গেল। অশেষ অসুবিধা ভোগ করে তিন দিন ধরে এখানে থাকার চাইতে এখান থেকেই কেদারযাত্রা করা ভাল, কিন্তু এই অসুবিধার মধ্যে আমাকে একা ফেলে রেখে কেদারযাত্রা করতে সকলেরই সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল, অথচ দেখলাম, কেদার যাবার সকলেরই মনে মনে বেশ ইচ্ছা আছে।

আমি দ্বিধা বোধ করতে লাগলাম। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে বৈঠক বসল। আমি একাই থেকে যেতে চাইলাম। তাতেও সকলে মন খুলে সায় দিতে পারলেন না। নিজের উপরে একটা অনির্দেশ্য ও অস্পষ্ট চাপ বোধ করতে লাগলাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা আমার স্বভাব নয়। বেশ বুঝলাম আমার সঙ্গে যাওয়াটাই সকলে চান। ভারি অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম।

এদিকে বদরী থেকে ফিরেই চা-সাহেবের পাওরিতে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। চমোলি থেকে পাওরিতে টেলিফোন আছে। বৈকালে চা-সাহেব টেলিফোনে

ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কথা কয়ে ঠিক করে এলেন যে, কেদার থেকে ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে চা-সাহেবকে থাকতে হলে আমার থাকাটাও সঙ্গীরা অনুমোদন করবেন। কেন না বিদেশে বিভুঁইএ আমাকে একা ফেলে রেখে যেতেই তাঁদের দ্বিধা হচ্ছিল। চা-সাহেব থেকে গেলে সে প্রশ্ন হয় তো উঠত না।

সে যাই হোক। অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিলাম। আমার অনিচ্ছার উপরে কেদারের আকর্ষণই জয়যুক্ত হল। অনাদিকাল ধরে তাই-ই হয়ে আসছে। আমরা কেবল মনে করি আমাদের ইচ্ছাতেই বুঝি কাজ হয়। ইচ্ছা এক। বহুধা তার প্রকাশ, অজ্ঞতায় এবং জ্ঞানে। কিন্তু মূলের সঙ্গে সেই প্রকাশের বিরোধ হতে পারে না। জয় হোক, তাঁর ইচ্ছার জয় হোক।

অতঃপর সকলে মিলে কেদার-দর্শনেই যাত্রা করলাম। আমাদের উলটো পরিক্রমা করা হল। তা হোক।

গোপেশ্বর

২৪শে মে সকাল বেলা মুখহাত ধুয়ে জয় কেদারনাথজীকি জয় বলে চমোলি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। অলকনন্দার পুল পার হয়ে আবার বদরীনারায়ণের রাস্তায় পড়লাম। এবারকার যাত্রা কেদারের দিকে। যে রাস্তা বদরী থেকে এসে তুঙ্গনাথ হয়ে, উখিমঠের কাছে মন্দাকিনী পার হয়ে, নালা চটিতে রুদ্রপ্রয়াগ-কেদারনাথের মূল রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, সেই রাস্তায় আমাদের যাত্রা শুরু হল।

এ রাস্তায় যাত্রীরা কখনও কেদারের অভিমুখে যায় না। কেদার দর্শন করে বদরীনারায়ণে তীর্থযাত্রা সমাপন করাই সাধারণ নিয়ম।

এমন কি যাঁরা চার ধাম একবারে করেন তাঁরাও যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী সেরে ত্রিযুগীনারায়ণের কাছে একেবারে কেদারের সামনে এসে পড়েন। রাস্তা দুর্গম কিন্তু গঙ্গোত্রী থেকে অন্য আর কোন রাস্তা নাই। সেই রাস্তাই আগে তাঁদের কেদারের কাছে এনে হাজির করে দেয়। কাজেই এ রাস্তায় কেদার থেকে যাত্রী এসে বদরীর দিকে চলে যায়। সাধারণ দু একজন পথিক ছাড়া এ পথে বদরীর দিক থেকে কেদারের দিকে বড় কেউ একটা চলে না। তাই আমাদের যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের চিরাচরিত রীতির শুধু যে ব্যতিক্রম হল তা নয়, আমাদের সঙ্গে আমাদের দিকে যাবার কোন সঙ্গীই পাওয়া গেল না! মাঝে মাঝে দেখা গেল দুই একজন পাহাড়ি লোক আমাদের পিছন থেকে এসে নিজের নিজের গাঁয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের সামনে থেকে যাত্রীর পর যাত্রীর দল আসছে। বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমাদের এই 'উলটি পরিক্রমা'র কারণ জানতে চাইছে। আমাদের উত্তরটা তাদের মনঃপূত হচ্ছে না। হয় তো বা ভাবছে, কে জানে বাঙালীদের সবই বুঝি বা উলটো। অনেক যাত্রী অবশ্য আছে যারা একবারে এক ধাম মাত্র করে, অর্থাৎ কেবল বদরী দেখেই তারা ঘরে ফিরে যায়। আমরাও যদি তাই করতাম তা হলে উলটো পরিক্রমার প্রশ্নই উঠত না, এমন একটা সৃষ্টিছাড়া কাজও আমাদের করতে হত না। আমাদেরও, অন্তত আমার, সেই রকমই সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু কেদারের দুর্নিবার আকর্ষণ জয়যুক্ত হল এবং সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে, কতকটা যেন তাদের কৃপার পাত্র হয়ে, আমাদের উলটো পথ অতিক্রম করতে হল। ভরসা হল এই যে, কোন রকমে নালাচটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই আমরা সাধারণ জনস্রোতে মিশে যেতে পারবো। উলটো পরিক্রমার মার্কা তখন সহজেই খসে পড়বে। এমন প্রশ্নও আর আমাদের কেউ করতে পারবে না।

অলকনন্দার অপর পারে চমোলির উলটো দিকে লালসাঙ্গা।

বস্তুত যে লালসাঙ্গা সেই চমোলি। লালসাঙ্গা পেরিয়েই মস্ত বড় একটা চড়াই। আমার কষ্ট হবে মনে করে, বিশেষ আমার কেদার যাবার প্রারম্ভিক অনিচ্ছাকে কতকটা নরম করে নেবার জন্য সুবোধ একটা ঘোড়াওয়ালাকে এনে হাজির করল। আমি যতই ঘোড়ায় চড়তে আপত্তি করি সুবোধের ততই জেদ চড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় একবার চড়তে হল। কিন্তু ঘোড়াও এক মুহূর্তে আনাড়ি সওয়ারকে চিনতে পারলে। সে দুষ্টুমি করে একান্তভাবে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে আরম্ভ করল। আশঙ্কা হল, শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে গা ঘষে না দেয়। চট করে নেমে পড়লাম। ঘোড়াকে তখখুনি বিদেয় করে তবে অব্যাহতি পাই। অনেকখানি চড়াই অতিক্রম করে কতকটা সমান রাস্তা পাওয়া গেল। রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে লোকবসতি আরম্ভ হল। কাথিয়াল গাঁয়ে দুধ ও গরম জিলেপি খেয়ে নেওয়া হল। চমলগাঁও, আরাম চটি—ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে চমোলি থেকে মাইল তিনেক দূর গোপেশ্বরে হাজির হলাম। এখানেই দুপুরবেলার খাওয়া দাওয়া সারা ঠিক হল।

গোপেশ্বর বড় ও প্রাচীন জায়গা। গোপেশ্বর-শিবের মন্দির। শৈবসাধনার প্রাচীন ক্ষেত্র। এখানে হাইস্কুল আছে। কলেজ ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী করার চেষ্টা চলছে। বেশ বড় বাজার। অনেক-গুলো চটি। জলের বন্দোবস্ত ভাল। যাত্রীর বেশ ভিড়। সবাই কেদার-ফিরতি।

অধ্যাপক আয়ার এগিয়ে এসে আলাপ করলেন, হয় চা-সাহেবকে দেখে অথবা বাঙালী দেখে। সদালাপী মাদ্রাজী ভদ্রলোক। ঢাকায় শিক্ষাবিভাগে কাজ করতেন। অনেকদিন আগে ঢাকার দাঙ্গায় তাঁর স্ত্রী মারা যান। তার পরেই তিনি কাজকর্ম ছেড়ে এদিকে চলে আসেন। তাঁরই চেষ্টায় এখানে হাইস্কুল হয়েছে। তিনিই হেড মাস্টার। আরও নানান দিকে তিনি পাহাড়িদের

উন্নয়নের কাজ করছেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে কিন্তু উৎসাহে ভাটা পড়ে নাই। যখন পরিচয় পেলেন চা-সাহেব দিল্লির সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব্ এডুকেশনের অধ্যাপক, আর যখন শুনলেন সেখানকার অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসুর স্ত্রী আমাদের দলে রয়েছেন, তখন আমাদের মূল্য বেড়ে গেল। খুব খাতির যত্ন করলেন। বাসা থেকে সবজি পাঠিয়ে দিলেন। এমন কি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে চা-সাহেবকে সংবর্ধনা করবারও একটা আয়োজন করে ফেললেন।

এখানে বৈতরণী-কুণ্ড। স্নানে পাপক্ষয়। মেয়েরা সেখানে নাইতে গেলেন। আমরা নামবার সিঁড়ির বহর দেখে পেছিয়ে গেলাম। এত নিচে জল যে মনে হল আর একবার চমোলিতে নামা-ওঠা করতে হবে। বললাম, বদরী দর্শনে পুণ্যের হিসাবে যত পুণ্য জমা হয়েছে, তাতে নিশ্চয়ই আমাদের সকল পাপ বাতিল হয়ে গেছে। আমরা ক্ষীণপাপ হয়েছি। কাজেই আমাদের নলের জলেই কাজ চলবে। বেশ মোটা নল। প্রবল ধারায় জল পড়ছে। রোদের তাপও প্রচণ্ড। ঠাণ্ডা জলে স্নান করে শরীর জুড়িয়ে গেল। মনে হল, গোপেশ্বরের কৃপায় আমরা ধন্য হলাম।

স্নান সেরে ঠাকুর দেখতে গেলাম। শিবের মন্দির। মন্দির প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহ দেখলাম। বেশ বড় শিলা-বিগ্রহ। মন্দিরসংলগ্ন চত্বর সমস্তটাই বাঁধানো। এক পাশে বড় দোতলা দালান। সেখানে গোপেশ্বর মহারাজের গদি। মন্দিরের নিকটে এক বিশাল ত্রিশূল। তার গায়ে পুরোনো আমলের অক্ষরে খোদাই করা অনেক কিছু লেখা। লোকে বলে মহারাজ অনেক-মল্ল যুদ্ধ জয় করে গোপেশ্বরকে এই লৌহ-ত্রিশূল দান করেছিলেন। তাঁরই বিজয়কীর্তি না কি ত্রিশূলে লেখা আছে।

খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম সেরে তুটোয় সভায় যেতে হল। বিদ্যালয়-ভবনেই সভা। আমরা মোটঘাট বেঁধে তৈরি হয়ে গেলাম।

সভার কাজ সেরে ওখান থেকেই রওনা হবো। ছাত্রদের ভিড়। শিক্ষকও অনেকেই আছেন। চা-সাহেব ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিও কিছু বললেন। চীনে গান শোনালেন। সকলেই খুব খুশি। শিক্ষকদের সঙ্গে ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ-সালাপ হল। সকলকে নিয়ে ফোটো তোলা হল। আয়ার সাহেব ধন্যবাদ দিয়ে কিছু বললেন ও আমাদের তীর্থযাত্রার সফলতা কামনা করলেন। গুপ্তকাশীর মন্দির-কমিটির নিকট চিঠি দিলেন। ফেরার সময় সেখানে থাকার সুবিধা হবে। সকলের কাছে বিদায়-নমস্কার করে আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম।

মণ্ডল চটি

পাঁচ মাইল দূরে মণ্ডল চটি। সেখানেই আমাদের রাত্রিবাসের কথা। গোপেশ্বর থেকে অনেকটা নেমে যেতে হল। রাস্তার পাশে পাশে গ্রাম। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে চললাম। বৈরঙ্গিতে একটা ডাকঘর পেলাম। মাইল দুই আড়াই যেতেই আমরা একটা সমতল পেলাম। সুন্দর সমান রাস্তা। আমাদের গ্রামাঞ্চলের মত ধুলোর রাস্তা। কাঁকরের চিহ্নমাত্র নাই। দুধারে অনাড়ম্বর সুন্দর সুন্দর বাড়ি। কোথাও কোথাও স্কুল-বাড়ি। দুধারে সবুজের শোভা। চাষের খেত, বাগান, গাছপালা। আমাদের চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। অপরাহ্ণ বেলা। রোদ পড়ে গেছে। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। আমরা আনন্দে গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে দু এক জন গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তাদের সঙ্গে অল্প-স্বল্প আলাপও চলছে। খুব আরামেই পথ চলতে লাগলাম। মনে হল যেন বাঙলা দেশের মধ্যেই কোথাও পথ চলছি।

মণ্ডলচটিতে যখন পৌছলাম সন্ধ্যার আলো তখনও অল্প অল্প রয়েছে। পাশেই স্বল্পতোয়া বালিখিল্য নদী প্রায় সমতলে বয়ে চলেছে। বালিখিল্য নাম, লোকে বলে বালগঙ্গা। নদীতীরে ছোটবড় নানান আকারের পাথর ছড়ানো। এখানে সেখানে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। অল্প দূরেই ঘন বন। নির্জন গ্রামপ্রান্ত। স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ সন্ধ্যার মায়ালোকে অপরূপ হয়ে দেখা দিল! কালের বিরামহীন প্রবাহ থেকে একটি মুহূর্ত যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে। নিশ্চল, নিষ্কম্প, নিবিড় একটি মুহূর্ত। ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত প্রকৃতির শান্ত, স্তব্ধ একখানি ছবি। স্থির, অচঞ্চল, কালের পরিমাপবিহীন।

চটিটি বেশ। বাসের প্রশস্ত স্থান। যাত্রীর ভিড় নাই। জলের বন্দোবস্ত ভাল। হাত-পা ছড়িয়ে বেশ আরামেই রাত কাটানো গেল।

অরণ্য

২৫শে মে তারিখে চা-টা খেয়ে সকাল ছয়টায় মণ্ডলচটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সামনের ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ। সাত মাইল নিবিড় অরণ্য। চার মাইল দূরে অরণ্যের মধ্যেই একটি চটি। নাম পাঙ্গরবাসা বা জঙ্গলচটি। সাত মাইল পার হয়ে তুঙ্গনাথ-পাহাড়ের পাদদেশে ভুলোকনায় কয়েকটি চটি আছে।

শুনলাম, জঙ্গলে শের থাকে। তবে যাত্রী-চলাচলের সময়টায় তারা উপরে চলে যায়। কখনও কোন যাত্রীকে আক্রমণ করেছে এ রকম শোনা যায় নাই। মানুষকে সকলে ভয় করে। বেশি লোক-সমাগমের সময় জন্তু-জানোয়ার অন্যদিকে পালিয়ে যায়। তাই কোন দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। তবুও ভয়টা একটু থেকে

গেল। কথা হল, সবাই এক সঙ্গে যাওয়া হবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু উৎসাহের চোটে কথা ঠিক রাখা গেল না। কেউ এগিয়ে কেউ পিছিয়ে চলতে লাগলেন। মেয়েরা সুবোধবাবুর সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। আমরা তিন বুড়ো পিছিয়ে চললাম। চা-সাহেবও শেষ পর্যন্ত এগিয়ে পড়লেন। আমরা দুজনে পেছনেই রয়ে গেলাম।

ঘন বনের মাঝখান দিয়ে পথ। দুধারে নানা রকমের বড় বড় গাছ। বাঁ দিকে রাস্তা থেকে আরম্ভ করে পাহাড় তেরছা ভাবে উঁচু হয়ে ক্রমে দূরে সরে গেছে। ডান দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। ডান দিকের ঢালটা একটু কম। যতদূর দেখা যায় দু ধারেই বড় বড় গাছ। গাছের মাথায় মাথায় মেশামেশি। ঘন পত্রপল্লবের বেষ্টনী ভেদ করে সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করে না। সূর্যালোক পাবার জন্য বাধ্য হয়ে গাছগুলিকে উঁচু হয়ে উপর দিকে মাথা তুলে ধরতে হয়েছে। মেঘলা নয়, তবুও ছায়ায় ছায়ায় চলেছি। রোদের স্পর্শমাত্র নাই। যেন এই সবে সকাল হয়েছে।

ছায়াঢাকা বনপথে পাখির ডাক শুনতে শুনতে চলেছি। খুব ভাল লাগছে। এর আগে পথে এমন বন আর পাই নি। দুটো একটা পাখির ডাক শুনতে পেয়েছি কিন্তু নানা রকমের এত পাখির ডাক এ অঞ্চলে আর শুনতে পাই নাই। তবুও এই জঙ্গলের তুলনায় পাখি আরও বেশি থাকা উচিত ছিল। যাই হোক, কেন জানি না পাখির ডাক এখানে বেশ জোরালো। এই প্রথম কোকিলের ডাক শুনলাম। আমাদের দেশের কোকিলের চাইতে এদের গলার জোর ও আয়তন বেশি। প খি ডাকই শুনতে পেলাম, পাখি বড় একটা দেখা গেল না। দুটো একটা বন-মুরগি দেখতে পাওয়া গেল। অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার নজরে পড়ল না।

অসুস্থ চা-সাহেব

সুধীরবাবু আর আমি কথাবার্তা বলতে বলতে চলেছি। বুদ্ধিরামও আজ আমাদের সঙ্গে নাই। সে তার মাইজীর সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে দেখি চা-সাহেব আর সুশীলা। চা-সাহেব পড়ে পড়ে যাচ্ছেন। সুশীলা তাকে সামলে নিয়ে চলেছে। কি ব্যাপার? উদ্বিগ্ন হয়ে চোট-পায়ে এগিয়ে গেলাম। দেখি, চা-সাহেব খুব অসুস্থ, চলতে পারছেন না। সুশীলা তাঁকে সামলে সামলে নিয়ে চলেছে। শুনলাম চা-সাহেবের পেটটা ভাল নয়। রাত্রে বার কয়েক বাইরে গিয়েছিলেন। কাউকে কিছু বলেন নাই। আজ সকালে প্রথম দিকে আমাদের সঙ্গেই চলছিলেন। তার পরে বেশ এগিয়ে আগের দলের সঙ্গে মিলে যান। কিছুক্ষণ পরে সুশীলা দেখতে পায় চা-সাহেব চলতে পারছেন না। তখন সুশীলা তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেয় ও পিছিয়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। আর সবাই এগিয়ে চলে যায়। এখন চা-সাহেব ক্রমেই বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। আমরা চা-সাহেবের ভার নিয়ে সুশীলাকে আগে পাঠিয়ে দিলাম।

দুই চটির মাঝখানে যানবাহন মেলার উপায় নাই। ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঘোড়া কিছুই মিলল না। অর্ধেক পথ আসা হয়েছে। আর অর্ধেক পথ হাঁটতেই হবে। তা ছাড়া কোন উপায় নাই। চা-সাহেব আমাদের কাঁধে ভর দিলেন। আমরা ধীরে ধীরে তাঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললাম। একটু যাই। চা-সাহেব বসে খানিকটা জিরিয়ে নেন। আবার চলি। শেষে চা-সাহেব একেবারে শুয়ে পড়তে লাগলেন। কাঁধে ভর দিয়ে খানিকটা চলেন। আর রাস্তার

মাঝখানে শুয়ে পড়ে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করেন। এই রকম ভাবেই চলতে লাগলাম।

একবার বসি আর একবার উঠি। এইরকম করে কত দূর যে গেলাম তার ঠিক নাই। মনে হতে লাগল পথের যেন আর শেষ নাই। সময়েরও কোন আন্দাজ রইল না। সামনে একদল যাত্রী এল। কেদার থেকে বদরী চলেছে। সঙ্গে ডাণ্ডিতে একজন সওয়ারি। জিজ্ঞাসা করলাম, চটি কত দূর, কাছে যানবাহন কিছু মিলবে কি না? তারা বললে যানবাহন রাস্তায় কিছু মিলবে না। তবে চটি আর বেশি দূর নয়। অল্প গেলেই চটি মিলবে। চা-সাহেবের অবস্থা দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা জানাল যে সামনেই একজন বড় ডাক্তার যাচ্ছেন, জেনানা ডাক্তার। তাঁর ঔষধ এক দাগ খাওয়ালেই অসুখ ভাল হয়ে যাবে। শুনলাম, তাদের দলের এক জনের খুব বমি হচ্ছিল। মা-জীর এক দাগ ওষুধেই একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। 'বড়া ভারি ডাক্তার, বাবুসাব, বড়া ভারি ডাক্তার।' এত দুঃখেও হাসি পেল। বর্ণনায় বুঝলাম আমাদের সুশীলাই সেই ভারি ডাক্তার। আমাদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ভাণ্ডার সুশীলার কাছে একটা চামড়ার কেস্-এ থাকে। সে-ই সকলকে ওষুধপত্র দেয়। সুশীলার নাম হয়েছে দেখে খুশি হলাম।

যাই হোক অনেক দুশ্চিন্তাভোগের পর জঙ্গলচটিতে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বিছানা করে চা-সাহেবকে শুইয়ে দেওয়া হল। বড় ডাক্তার সুশীলার হাতে তাঁর চিকিৎসার ভার। আজ এখানেই থাকা। পথ-হাঁটা আর নয়।

নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটু জায়গা করে লোকবসতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। খানচারেক চটি রয়েছে। চটিওয়ালারা ছাড়া অন্য কোন লোকের বাস এখানে নাই। নিকটে আর কোন গ্রাম আছে বলেও মনে হল না। যাত্রীও বেশি নাই। খুব নির্জন জায়গা। চা-সাহেব সমস্তদিন পড়ে পড়ে

ঘুমোলেন। আমরা জঙ্গলের মধ্যেই এদিক ওদিক একটু বেড়ালাম। বেড়াবারও বেশি সুবিধা নাই। একটিই মাত্র রাস্তা। মণ্ডল চটি থেকে এসে ভুলোকনার দিকে চলে গেছে।

সন্ধ্যার পর বেশ করে চা খেয়ে আড্ডা জমানো গেল। খাবার তৈরি হচ্ছে। চা-সাহেব পাশে ঘুমোচ্ছেন। বাইরে ঘনীভূত অন্ধকার। ঘরে লণ্ঠনের আলোয় আমরা জনকয়েক গল্প করছি। এমন সময় কিছু দূর থেকে চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। আলো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে শুনি কয়েকটি নরনারীর আকুল আর্তস্বর। সবাই একসঙ্গে কথা বলছে। তাতে আবার হিন্দী ভাষা। কিছুই বুঝতে পারি না। খানিক বাদে উদ্ধার করা গেল, পথ ঠিক করতে পারছে না, তাই আলো দেখাতে বলছে। একটু এগিয়ে গিয়ে আলোটা উঁচু করে ধরলাম। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে কোন কাজ হল বলে আমাদের মনে হল না, কিন্তু গুটিকয়েক শ্রান্ত ক্লান্ত ভয়ার্ত লোক কোন রকমে এসে চটিতে পৌঁছে গেল। একজন বৃদ্ধা এসেই শুয়ে পড়ল। দেখি, অজ্ঞান হয়ে গেছে। চোখে মুখে জল দিয়ে হাওয়া করতে করতে তার জ্ঞান ফিরে এল। গরম দুধ খাইয়ে তাকে শুইয়ে দেওয়া হল। দলের অন্য লোকদের কাছে শুনলাম বুড়ির সঙ্গে আপন জন কেউ নেই। সে একা পথ চলতে চলতে তাদের দলে ভিড়ে পড়েছে। ভুলোকনার ওধারে চোপতা চটি থেকে তারা তুঙ্গনাথে উঠেছিল। বৈকালে তুঙ্গনাথ থেকে নেমে ভুলোকনায় না থেমে তারা সোজা চলে এসেছে। দূরত্ব ও সময়ের হিসেবটা ঠিক করতে পারে নি। পথেই সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পাহাড়ের পথে একেই তো সন্ধ্যার পর লোক চলাচল করে না। তাতে আবার এখানটায় ঘন বনের জমাট অন্ধকার। চোখে কিছুই দেখা যায় না। তুঙ্গনাথের কঠিন চড়াই-উতরাইএর পথক্লান্তি, তার উপর গভীর অন্ধকার। দুইএ মিলে লোকগুলিকে দিশেহারা করে তুলেছে।

পরের দিন, ২৬. ৫ তারিখ, সকালে দেখি চা-সাহেব বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমি আর একদিন এখানে বিশ্রাম করার কথা বললাম, কিন্তু চা-সাহেব রাজি হলেন না। বললেন, তিনি বেশ হাঁটতে পারবেন। হিন্দুস্থানী বুড়িটিও ইতিমধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। পথকষ্টের চাইতে ভয়েই এরা কাবু হয়েছিল বেশি। তাকে কিছু খাইয়ে ও সাহায্য করে বিদেয় দেওয়া হল। আমরাও চা-জলখাবার খেয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

তুঙ্গনাথ

এখান থেকে মাইল চারেক দূরে তুঙ্গনাথ পাহাড়ের পায়ের কাছে ভুলোকনা চটি। সেখান থেকে খাড়া চড়াই পথে দু মাইল উঠে তুঙ্গনাথ পাহাড়ের মাথায় তুঙ্গনাথ দর্শন করে, পাহাড়ের অপর দিকে আবার খাড়া উতরাই পথে দু মাইল নেমে পাহাড়ের পাদদেশে চোপতা চটিতে পৌঁছতে হয়। পাহাড়ের পাদদেশে একদিকে ভুলোকনা, অপর দিকে চোপতা। দুইএর ব্যবধান এক মাইল। এই এক মাইল ভূমির উপর তুঙ্গনাথ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত উঠে গেছে। চোপতা থেকে দুই মাইল লম্বা এক বাহু তুঙ্গনাথের শীর্ষদেশে উঠেছে। অনুরূপ লম্বা আর একটি বাহু ভুলোকনা থেকে তুঙ্গনাথের মাথা পর্যন্ত উঠেছে। যারা তুঙ্গনাথে না ওঠে তারা ভুলোকনা থেকে এক মাইল সমতল পথ হেঁটেই চোপতা পৌঁছতে পারে।

জঙ্গলচটি থেকে বেরিয়ে একটা বড় চড়াই অতিক্রম করে ও অল্প কিছু উতরাই করে উঁচু জায়গাতেই অনেকটা সমতল পথ পাওয়া গেল। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে যেন মালভূমির মত অনেকটা জায়গা। আমাদের ডানদিকের সমস্তটাই খোলা হয়ে

গেছে। দৃষ্টি কোথাও বাধা পাচ্ছে না। যত দূর দেখা যায় গিরিশ্রেণীর পর গিরিশ্রেণী দেখা যাচ্ছে।

বন পার হতেই প্রখর রোদ পাওয়া গেল। সকাল বেলা। কিন্তু রোদের তেজ এর মধ্যেই বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে। সাড়ে আটটা নয়টায় ভুলোকনা পৌঁছে গেলাম। সুশীলা, সুধীরবাবু, বুদ্ধিরাম ও আমি পিছনে আসছিলাম। আর সকলে আগেই পৌঁছে গেছেন। ভুলোকনা পৌঁছে দেখি সবাই তুঙ্গনাথে ওঠার উদযোগ করছেন।

আমি একটু বিপন্ন বোধ করলাম। বইএ পড়েছিলাম তুঙ্গ-নাথের চড়াই খুব কঠিন। এ অঞ্চলের তীর্থের মধ্যে তুঙ্গনাথই সব চাইতে উঁচু ও দুর্গম। বদরীনাথ শহর পাহাড়ের কোলে একটি উপত্যকার মধ্যে। কেদার তার চাইতে উঁচু কিন্তু তাও পাহাড়ের শীর্ষদেশে নয়। তুঙ্গনাথ চারদিকের মালভূমির মধ্যে একাই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার শীর্ষদেশে হল তুঙ্গনাথ শিবের মন্দির। বদরীর উচ্চতা ১০,৫০০ ফুট, কেদার ১১,৭৫০ ফুট, আর তুঙ্গনাথ হল প্রায় ১৩,০০০ ফুট উঁচু।

তুঙ্গনাথের চড়াই কঠিন চড়াই। পাহাড় বেশি হেলানো নয়। তারই গায়ে রাস্তা খাড়া উঠে গেছে। বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে জোশিমঠ পর্যন্ত রাস্তা যে রকম এখানে তার চাইতেও বেশি খাড়া। রাস্তা কিন্তু সোজা একটানা উপরে উঠে যায় নি। খানিকটা ডান থেকে বাঁয়ে, তার পর বাঁ থেকে ডাইনে, আবার ডাইনে থেকে বাঁয়ে, এই রকম করে উপরে উঠে গেছে। প্রত্যেকটি খণ্ড-রাস্তা তার আগের খণ্ড-রাস্তার সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ তৈরি করে ভেঙ্গেছে। এক এক দিকের কোণবিন্দুগুলিকে যদি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যোগ করে দেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে দু দিকে দুটি সমান্তরাল রেখার বেষ্টনীর মধ্যে খণ্ড-রাস্তাগুলি তির্যক ধাপের মতন বিধৃত হয়ে রয়েছে। মালভূমির তল থেকে এই রকম দু মাইল পথ পাহাড়ের

মাথায় উঠে গেছে। দু মাইলে প্রায় চার সাড়ে-চার হাজার ফুট উঠতে হয়, কেন না ভুলোকনা বোধ হয় সাড়ে আট কিংবা নয় হাজার ফুট উঁচু। আবার উতরাই-এর বেলায়ও অপর দিকে রাস্তা অনুরূপভাবে দু মাইলে চার সাড়ে-চার হাজার ফুট নেমে চোপতা-চটিতে পৌঁছেছে। কাজেই উতরাইও সহজ কাজ নয়। আছাড় না খেয়ে দৌড়োতে পারলে অবশ্য খুব অল্প সময়েই নামা যায়। শুকনো রাস্তাতেই আছাড় খাবার সম্ভাবনা, তার উপর যদি আবার বৃষ্টি থাকে তবে তো কথাই নাই।

তুঙ্গনাথ কঠিন চড়াই, সে কথা আগেই আমরা শুনেছিলাম। তাই ঠিক ছিল ভুলোকনায় রাত কাটিয়ে, নতুন উৎসাহ নিয়ে, ভোর ভোর আমরা তুঙ্গনাথে উঠবো। সেই হিসাবে রাস্তা চলার ছক কাটা ছিল। মাঝখানে চা-সাহেবের অসুখে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সকালবেলা মাইল চারেক চড়াই-উতরাই করে প্রখর রোদের মধ্যে আমরা ভুলোকনা পৌঁছলাম। সঙ্গীরা তখনই তুঙ্গনাথে উঠতে রাজি। তা না হলে আবার একটা দিন শুধু শুধু ভুলোকনায় কাটাতে হয়। আমি একটু ইতস্তত করে পিছিয়ে গেলাম। দেখলাম, আমি উঠতে গেলে চা-সাহেব একা একা থাকতে চাইবেন না, অথচ তাঁর শরীরটা যথেষ্ট সবল হয় নাই। এই অবস্থায় সঙ্গীরা তুঙ্গনাথ উঠে গেলেন। চা-সাহেব ও আমি বুদ্ধিরামকে নিয়ে সোজা চোপতা চলে গেলাম। ওখান থেকে চোপতা এক মাইলের একটু উপরে। সেখানেই আমরা সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করবো ঠিক হল।

চোপতা

আমাদের ডানদিকে উত্তুঙ্গ তুঙ্গনাথ। বাঁয়ে অনেক দূর পর্যন্ত সমতল মালভূমি। তার ওপারে ধূসর গিরিশ্রেণী আমাদের দৃষ্টি রোধ করে রয়েছে। সামনের গিরিশ্রেণী পার হয়ে আরও ওপারে নজর চলে না। তুঙ্গনাথ অতিক্রম করে চোপতা পৌঁছতেই ডান দিকটা সম্পূর্ণ অবারিত হয়ে গেল।

সে কি অপরূপ শোভা! আমরা রাস্তার উপরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে দৃষ্টিরোধ করার মত ছোট কোন গিরিশ্রেণী নাই। সমস্ত দিকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তুষারশুভ্র হিমমণ্ডিত গিরিশ্রণী। একটি দুটি চূড়া নয়, একটি সম্পূর্ণ গিরিশ্রেণী তুষারমণ্ডিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক একবার মেঘের চাদরে ঢাকা পড়ছে, আবার সূর্যালোকের প্রখর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চটি ঠিক করার কথা মনে রইল না। বুঝলাম, তুঙ্গনাথে যাঁরা উঠেছেন, মেঘ না থাকলে তাঁরা চারদিকের অপরূপ শোভা উপভোগ করতে পারবেন।

চটিওয়ালাদের ডাকাডাকিতে চমক ভাঙল। রাস্তার বাঁ দিকের একটা চটি বেছে নিলাম। তার দাওয়ায় বসেই সম্পূর্ণ হিমমণ্ডিত গিরিশ্রেণীকে দেখতে পাওয়া যাবে। বুদ্ধিরাম রান্নার জোগাড়ে লেগে গেল। আমরা দুপুর পর্যন্ত পাহাড়ের অপূর্ব শোভা উপভোগ করলাম। আমাদের সৌভাগ্য, মেঘ বেশি ছিল না। তাই অনেকটা সময় ধরে আমরা গিরিরাজের শোভা দেখতে পেলাম।

চোপতায় খুব জলকষ্ট। জলের নল বন্ধ। একটা নিচু জায়গায়, বোধহয় নিচেকার কোন উৎস থেকে তির তির করে

একটু জল উপরে উঠছে! মগে করে কোন রকমে একটু একটু জল তুলে স্নানপর্ব সমাধা করলাম। খাওয়ারও ঐ জল, একটু থিতিয়ে নিয়ে খেতে হবে। তুপুরে তিনটি প্রাণী খেয়ে নিলাম। ততক্ষণে গিরিরাজ মেঘের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ফেলেছেন। অথচ আমাদের এখানে প্রচণ্ড রোদ। জলাভাবে এখানে রাত কাটানো যাবে না। পরের চটিতেই যেতে হবে। কিন্তু তুঙ্গনাথ-যাত্রীরা ফিরে না এলে যেতেও পারছি না।

সন্ধ্যার একটু আগে তুঙ্গনাথ-যাত্রীরা ফিরে এলেন। তুপুরের খাওয়াটা তাঁরা পাণ্ডার সাহায্যে উপরেই কোন রকমে সেরে নিয়েছেন। তুপুরটা পাহাড়ের গায়েই বিশ্রাম করে কাটিয়েছেন। বিকেলে নেমে এলেন খুব অল্প সময়েই। নামার সময়ে কেউ কেউ আছাড়ও খেয়েছেন। শুনলাম ওখানকার শোভা অপূর্ব। কোন দিকে দৃষ্টি রোধ করার মত মধ্যবর্তী গিরিশ্রেণী নেই। চার দিক একেবারে খোলা, অবারিত। চার দিকেই হিমমণ্ডিত গিরিশীর্ষ। চোপতা থেকে আমরাও অনুমান করতে পারছিলাম, সে এক অপরূপ দৃশ্যই হবে, ভাষায় তাকে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। রসাস্বাদেই রসের উপলব্ধি, বর্ণনায় তার সন্ধান মেলে না। তবুও মেঘের জন্য তাঁরা বেশিক্ষণ এই দৃশ্য পান নি। চোপতায় আমরা যতখানি পেয়েছিলাম, তা বোধ হয় তাঁদের চাইতে বেশি সময়ের জন্য। ওঁরা বললেন ওপরে বেশ শীত। তুপুরের রোদের মধ্যে বসে থাকতে ওঁদের ভালই লাগছিল।

বানিয়াকুণ্ড

মোটঘাট বাঁধাই ছিল। সকলে নামতেই পথে বেরিয়ে পড়া গেল। এখানে পানীয় জলের অভাব। এক মাইল দূরে বানিয়া-কুণ্ড। সেখানে প্রচুর জলের বন্দোবস্ত। সেখানেই রাত্রিবাস করতে হবে। এই এক মাইল পথ একটানা নিচে নেমে গেছে। একেবারে ছুটতে ছুটতে নামতে হল। কোথাও দাঁড়াবার জো নাই। খুব কম সময়ের মধ্যে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই, বানিয়াকুণ্ড পৌঁছে গেলাম। চার দিকে পাহাড়ে-ঘেরা একটু নামাল জায়গা, ঠিক সমতল নয়। একটি ক্ষীণ জলধারা, কোথা থেকে এল বোঝা গেল না। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঘন পাইন গাছের সার। পাইন গাছের বন বললেও চলে। পাহাড়ে অনেক জায়গায় সন্ধ্যার অন্ধকার নামে দেরিতে। এখানে, মনে হল, অন্ধকার তাড়াতাড়ি নেমে এল।

বানিয়াকুণ্ডে অনেকগুলো চটি। ঠিক গ্রামের মত মনে হল না। চটি কয়েকটিই সম্বল। গ্রাম হয় তো বা একটু দূরে, তবে সে রকম কিছু মনে হল না। একটি প্রশস্ত চটিতে কায়েম হওয়া গেল। গরম চা খেয়ে আসর জমানো হচ্ছে, এমন সময় দেখি দুই চটিওয়ালাতে দারুণ ঝগড়া। আমাদের চটিওয়ালার কাছে ভাল ডাল না পেয়ে সুবোধ আর এক চটিওয়ালার দোকান থেকে ডাল কিনে এনেছে। এটা চটিওয়ালাদের রীতির বিরোধী। জায়গা যে দেবে সে ভাড়া নেয় না। কাজেই কোন কিছু জিনিস কিনতে হলে তারই দোকান থেকে কিনতে হবে। এক চটিওয়ালার বাসিন্দাদের কাছে অন্য চটিওয়ালা জিনিস বিক্রি করবে না। জিলেবি, লাড্ড

বা জলখাবারের জিনিসের বেলা কোন নিয়ম নাই, কেন না সেগুলো সকল চটিতে থাকে না। কিন্তু মোটা খাবারের জিনিসপত্রের বেলা নিয়ম বেশ কড়া। এই নিয়ম ভাঙ্গার জন্য দুই চটিওয়ালার ঝগড়া। অনেককষ্টে ঝগড়া মেটানো হল। পেঁয়াজ জোগাড় করা গিয়েছিল। রাত্রে গরম গরম রুটি আর আলু-পেঁয়াজের তরকারি বেশ ভালই লাগল। শীত মন্দ নয়। বানিয়াকুণ্ডের উচ্চতা বোধ হয় সাড়ে সাত হাজার ফুট হবে। চোপতা থেকে হাজার খানেক ফুট অন্তত কম।

২৭ তারিখ ভোরে চা-সাহেব, সুধীরবাবু আর আমি একটু উঁচু জায়গায় গিয়ে উঠলাম, সূর্যোদয় দেখবার জন্য। সে দিকটায় একটু ফাঁক ছিল। রঙের খেলা কিছু দেখা গেল কিন্তু সূর্যোদয় ঠিক-ঠিক দেখতে পাওয়া গেল না।

গোলিয়াবগড়

চা-টা খেয়ে তোড়জোড় করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা ক্রমেই নিচে নেমে গেছে। একটানা উতরাই। কোন জায়গায় কিছু বেশি দ্রুত। কোন জায়গায় বা একটু কম। দোগলভিটা এক মাইল দূর—সাত হাজার ফুট। এখানে বনবিভাগের এক ডাকবাংলা আছে। পৌথিবাসা দেড় মাইল। অনেকগুলি চটি। আড়াই মাইল দূরে দোয়েড়া। ছয় হাজার ফুট। হুড় হুড় করে নেমে চলেছি। এক মাইল দূরে গোলিয়াবগড়ে এসে থেমে গেলাম। সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচু। যতদূর নামবার প্রায় নেমে এসেছি। এর পরের চড়াইটা ভেবে মনে রীতিমত আশঙ্কা হল। বদরী থেকে কেদার যাচ্ছি তাই। কেদার থেকে বদরী যেতে হলে এই সমস্ত পথটা চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যেতে হত। গোলিয়াবগড়ের মাঝখান দিয়ে এক বড় ঝরনা প্রচণ্ড গতিতে নিচে নেমে গেছে। প্রচুর জল।

দুপুরটা এখানেই কাটানো ঠিক হল। কাপড় চোপড়ে সাবান দিয়ে নেওয়া হল। আরাম করে স্নানটান সেরে আসর জমানো গেল। খাবার দেরি আছে। সুবোধের ছেলে দীপুর আজ জন্মদিন। রেণু তাই কোমর-বেঁধে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। ছেলে কারও হাজির নেই। তাই জন্মদিনে তার কথাই মায়েদের বেশি করে মনে হয়। সেইজন্য জন্মদিনের এই উৎসব পালনে মায়েদের খুব বেশি আগ্রহ। এই পাহাড়ের রাজত্বে কোথা থেকে কেমন করে সব জোগাড় হল, জানি না। কিন্তু খাবার সময়ে দেখি নানা রকমের আয়োজন হয়েছে। দীপুর কল্যাণ কামনা করে পরিতোষের সঙ্গে ভোজনপর্ব সমাধা করলাম। উৎসবের কথা জানিয়ে ছেলের কাছে আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি দিলাম। গুরুভোজনের পর বিশ্রামটাও দীর্ঘ হল। অপরাহ্ণ-বেলায় বেরিয়ে পড়লাম।

চড়াই একটু আরম্ভ হল। কিন্তু যা আশঙ্কা করেছিলাম তার কিছুই নয়। বেশি উঁচুতে উঠতে হল না। দু মাইল দূরে কাঁথা চটি। পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। সাড়ে চার হাজার ফুট থেকে মোটে আর পাঁচ শ ফুট উঠতে হল।

উখিমঠ

কাঁথা থেকে উখিমঠ তিন মাইল, চার হাজার ফুট উঁচু। কাঁথা থেকে যেতে কিছুটা নামতে হল। থানাটা সাড়ে চার হাজার ফুট। উখিমঠ শহর চার হাজার ফুট।

সন্ধ্যার আগেই উখিমঠ পৌঁছে গেলাম। শহর থেকে আধ-মাইল আগেই থানা পাওয়া গেল। থানার দারোগা এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলেন। আলাপ করতে করতে আমাদের সঙ্গেই চলতে লাগলেন। সকলের খাদি-পরা দেখেই

বোধ হয় তিনি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। গাড়োয়াল জেলার লোক। নিজের জেলার প্রতি মমত্ববোধ ও জেলার জন্য মনে বেশ গর্বের ভাবও রয়েছে। ইয়োরোপের যে কোন পার্বত্য অঞ্চলের চাইতে এখানকার শোভা যে কিছুমাত্র কম নয়, এবং যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থার উন্নতি হলে তুনিয়ার ভ্রমণকারীরা যে এখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসবে, সে কথা খুব গর্বের সঙ্গে বলতে লাগলেন। এ অঞ্চলের কোথায় কোথায় সুন্দর জায়গা ও মনোরম দৃশ্য আছে তার দীর্ঘ তালিকা দিলেন। একটু অভিযোগেরও আভাস পাওয়া গেল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নৈনিতালের লোক। তাই এরই মধ্যে নৈনিতালের অনেক উন্নতির ব্যবস্থা হয়েছে অথচ গাড়োয়ালের দিকে কারও কোন দৃষ্টিই নাই, ইত্যাদি। বেশ সদালাপী ভদ্রলোক। চটি পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিলেন।

আমার মাঝে মাঝে কোমরে ব্যথা হয়। সম্ভবত বাত। এবার দিল্লি থেকে আসার সময় ডাক্তার গুহর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে এসেছিলাম। এতদিন কোমরব্যথাটা জোর করে নাই। উখিমঠের আগে থেকেই সেটা একটু একটু প্রকাশ পায়। উখিমঠে এসে বেশ চেপে ধরল। চা-জিলিপি খেয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। আর সকলে আরতি দেখতে গেলেন। আমার জন্য পরের দিন অর্থাৎ ২৮ তারিখও এখানে বিশ্রাম করা ঠিক হল।

২৮ মে সকালে ডাক্তার গুহের ওষুধ খেয়ে নিয়ে সারাদিন বিশ্রাম করলাম। বৈকালের দিকে একটু সুস্থ বোধ করলে মন্দির দেখতে বার হলাম। মেয়েরা উপরে গ্রামের দিকে বেড়াতে গেলেন।

উখিমঠ বেশ বড় জায়গা। বড় বাজার, দোকানপাট, থানা, ডাকঘর ও তারঘর, অনেকগুলি চটি ও ধরমশালা আছে। সাধুদের জন্য সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। কেদারের প্রধান পুরোহিত বা রাওলের গদি এখানেই। শীতের ছয় মাস যেমন বদরীনারায়ণের বিগ্রহমূর্তি

জোশিমঠে নেমে আসেন এবং সেখানেই তাঁর পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা হয়, কেদারের পূজারীরাও তেমনই শীতের প্রারম্ভে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে কেদারের বিগ্রহমূর্তি নিয়ে উখিমঠে নেমে আসেন। মন্দিরে ধূপ, দীপ, ও শুকনো ভোগ রেখে দিয়ে মন্দিরের দরজা ছয় মাসের জন্য তালা-বন্ধ করা হয়। পূজারীরা দাবি করেন ছ মাস বাদে যখন বরফ কেটে পথ পরিষ্কার করে মন্দিরের দরজা খোলা হয় তখনও সেই দীপ না কি প্রজ্বলিত থাকে। সে যাই হোক এ ছয় মাস কেদারে লোকজন থাকে না। সমস্ত শহর তুষারাবৃত হয়ে স্তব্ধ মূক হয়ে থাকে। সাক্ষী থাকে না, ভক্ত থাকে না। ভজন পূজন কিছুই হয় না। তুষারগৃহে তুষারশয্যায় দেবতা থাকেন একাকী, একান্তভাবে নিঃসঙ্গ।

সেই সময়ে এই উখিমঠেই তাঁর প্রতিনিধি বিগ্রহমূর্তির পূজো-আচ্চা হয়। এখানকার মন্দিরও শিবের মন্দির। মন্দিরে হর-পার্বতীর মূর্তি। জোশিমঠের আশপাশ পর্যন্ত যেমন বিষ্ণুক্ষেত্র, উখিমঠের আশপাশে অনেক দূর পর্যন্ত তেমনই শিবক্ষেত্র। এ অঞ্চলে শিবেরই প্রভাব। অথচ মঠের নাম উখিমঠ। পৌরাণিক শিবভক্ত অসুর বান-এর কন্যা উষার নামানুসারে এই মঠের নাম উষামঠ বা উখিমঠ হয়েছে। লোকে বলে এ অঞ্চলে বানাসুরের রাজত্ব ছিল। বান-এর রাজধানী শোণিতপুর এখান থেকে দশ বারো মাইল দূর। সেখানে নাকি জঙ্গলের মধ্যে এখনও এক বসতি আছে। আর সেই জঙ্গলই বান-এর পুরোনো রাজধানীর ভগ্ন অবশেষ। উখিমঠে উষা ও অনিরুদ্ধেরও মূর্তি আছে। উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ-মণ্ডপ বলে একটা জায়গা এখনও দেখানো হয়। উখিমঠের রাওলেরা ঐশ্বর্যশালী। অনেক তাঁদের ধন-সম্পত্তি। গদিতে তাঁদের পদমর্যাদা ও আড়ম্বরের অনেক চিহ্ন যাত্রীদের দেখানো হয়।

মন্দির থেকে ফিরে দেখি গ্রাম থেকে টোম্যাটো ও শিম সংগ্রহ

করে মেয়েরা ফিরে এসেছেন। বললেন, গ্রামের মেয়েরা খুবই ভাল। তাদের বাড়িতে বিদেশী তীর্থযাত্রী বেড়াতে গিয়েছে দেখে তারা খুবই খুশি। গরিব মানুষ, কোথায় এদের বসাবে, কি দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। শেষে খেত থেকে টোম্যাটো ও শিম তুলে এনে দিলে। টোম্যাটো বড় হয় নাই, শিমও কচি। এরা তুলতে বারণ করলে। কিন্তু তারা শুনল না। তাই তুলে এনে দিল। অভ্যাগতকে কিছু দিয়ে তো অভ্যর্থনা করতে হবে।

২৯শে মে সকালবেলা উখিমঠকে নমস্কার করে বেরিয়ে পড়া গেল। পারুল ও আমার জন্য দুটি কাণ্ডি ঠিক করা হল। বারো আনা করে মাইল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কেদার পর্যন্ত যাবে। দরকারমত আমরা চড়ে বসবো। আমার খুব ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শরীরের অবস্থা দেখে অস্বীকার করতে সাহসও হল না।

ওখানে তিন রকমের যান—ঘোড়া, কাণ্ডি আর ডাণ্ডি। কাণ্ডি হল ঝুড়ির মত একটা চেয়ার। তার নিচের দিকে দড়ি দিয়ে একটা ছোট তক্তা ঝোলানো। গুড়িসুড়ি মেরে চেয়ারে বসতে হয়। পা দুটো ঝোলানোই থাকে। মাঝে মাঝে তক্তায় পা লাগিয়ে পা দুটোকে একটু টান করে নেওয়া যায়। এক জন কাণ্ডিওয়ালা কাণ্ডিটাকে পিঠে করে নিয়ে চলে। হাঁটার পরিশ্রম বাঁচে বটে কিন্তু ভারি অসুবিধা। শরীরটা এক অবস্থায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, নড়া-চড়ার একটুও জো থাকে না, আর নিজেকে একান্ত অসহায় বলে মনে হয়। ডাণ্ডিটা ছড়ানো আরাম-কেদারার মত, চার কোণে ডাণ্ডা লাগানো। চার জনে কাঁধে করে নিয়ে যায়। ভাড়া বেশি। আরামও বেশি। পা ছড়িয়ে আধা-হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকা যায়।

উখিমঠের নিচ দিয়ে মন্দাকিনী বয়ে চলেছে, আমাদের যাত্রাপথের বাঁ দিক দিয়ে। উখিমঠের ঠিক উলটো দিকে মন্দাকিনীর অপর পারে গুপ্তকাশী। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে যে রাস্তা

কেদার চলে গিয়েছে, সেই রাস্তার উপরেই গুপ্তকাশী একটি বড় জায়গা, তীর্থস্থানও বটে। ঐ রাস্তাই আমাদের ধরতে হবে। অথচ উখিমঠ থেকে গুপ্তকাশীতে পারাপারের কোন উপায় নাই। তাই একটু এগিয়ে আমাদের নদী পেরোতে হবে। উখিমঠ থেকে খাড়া উতরাই করে বেশ খানিকটা নামতে হবে। আবার নদী পার হয়ে খাড়া চড়াই পথে বেশ খানিকটা উঠতে হবে।

মৈখণ্ডা

তাই সত্ত কোমরব্যথার পরেই চড়াই-উতরাই করতে আর সাহস হল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাণ্ডিতে উঠতে হল। উখি থেকে নামবার পথেই, মন্দাকিনীর ধারে, একটু প্রশস্ত জায়গায় উখির বিত্তায়তন। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। নির্জন পরিবেশ। লোকালয় থেকে একটু দূরে। বিত্তাচর্চার উপযুক্ত স্থানই বটে। মন্দাকিনী পার হয়ে আড়াই মাইল দূরে নালাচটিতে পৌঁছে কেদারের মূল রাস্তায় উঠলাম। নালার উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট। উখিমঠের প্রায় কাছাকাছি। মন্দাকিনী অনেক নিচুতে বলে মাঝখানের চড়াই-উতরাইটা করতে হল।

নালায় এসে কাণ্ডি থেকে নেমে পড়লাম। নালা থেকে এক মাইল দূরে ভেতা চটি। ভেতায় ভদ্রেশ্বরের পুরোনো মন্দির। আমরা আর অপেক্ষা করলাম না। এগিয়ে চললাম। দু মাইল দূরে ব্যুঙ্গচটি। রাস্তা বেশ চড়াই। আবার কাণ্ডিতে চড়তে হল। ব্যুঙ্গে পৌঁছে নেবে পড়লাম। ব্যুঙ্গ প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। ব্যুঙ্গ থেকে প্রায় তুই মাইল দূরে আর একটু উঁচুতে মৈখণ্ডা, মহিষখণ্ড বা দোলা। এখানে মহিষমর্দিনী দেবীর মন্দির। তুপুরের মত এখানেই আস্তানা নেওয়া গেল।

দেবী দর্শন হল। এখানে খুব উঁচুতে একটা ঘণ্টা বাঁধা আছে। নিচে থেকে দড়ি ধরে ঘণ্টা বাজাতে হয়। সকলে মিলে ঘণ্টা বাজানো গেল। একটা দোলাও আছে। দোলায় দুলতে হল। দুপুরে ভূরিভোজ। প্রেমলতার ছেলে সুনীলের জন্মদিন। তাই ভোজের আয়োজন। সকলে মিলে সুনীলের কাছে চিঠি লেখা হল। এ সব বিষয়ে চা-সাহেবের উৎসাহই সকলের চাইতে বেশি। মনটি তাঁর তরুণেরই মত তাজা। এ বয়সেও সকল রকম ব্যাপারেই চট করে সাড়া দেয়। বিশ্রামের পর বৈকালের দিকে মৈখণ্ডা থেকে বার হওয়া গেল।

মাইল দেড়েক দূরে ফাটা চটি। বেশ বড় জায়গা। অনেকগুলি চটি। কাছেই ডাকবাংলা। পানচাক্কিতে গম ভাঙ্গা হচ্ছে। আমরা ফাটা পার হয়ে চললাম। ফাটা থেকে আড়াই মাইল দূরে বড়াসু। ছোট জায়গা। রাস্তার ধারে দুটি মাত্র চটি। নতুন ঘরদোর। পাশে এক ব্যবসায়ীর বড় দোকান-বাড়ি। নিকটে আর কোন ঘরবাড়ি নাই। গ্রামটি পাহাড়ের উপর দিকে। রাস্তা থেকে দেখা যায় না। বেশ নিরিবিলি জায়গা। আমাদের খুব পছন্দ হল। সন্ধ্যা ত হয়ে এসেছে। রাতটা বড়াসুতেই কাটানো ঠিক হল। হাত-পা ধুয়ে উনুনের কাছে গোল হয়ে বসে চটিওয়ালার সঙ্গে মজলিস জমানো গেল। গাঁয়ের কথা সব শোনা হল। ছোট গ্রাম। গরিব সব পাহাড়ির বাস। এক ঘরই বোধ হয় একটু সঙ্গতিপন্ন। কিন্তু গাঁয়ের লোকের উৎসাহ আছে। তাদের ওখানে এখন রামায়ণ গান হচ্ছে। সারারাত ধরে তারা তাই শোনে। এমন গান কিছুদিন ধরে চলবে। চটিওয়ালা বেশ আলাপী লোক। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ সালাপ চলল।

শোনপ্রয়াগ

সকালে চা খেয়ে চটিওয়ালার কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম। এক মাইল বদলপুর। দেড় মাইল রামপুর। রামপুরে ধরমশালা ও অনেকগুলো চটি। বাজার আছে। কিছুদূর এগিয়ে বাঁ দিকে ত্রিযুগীনারায়ণের রাস্তা। বেশি দূর নয়। ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে আবার কেদারের পথে নামা যায়। ঠিক করলাম ফেরার পথে ত্রিযুগীনারায়ণ সারা যাবে। এখন কেদার আমাদের মন টানছেন।

রামপুর থেকে একটু নেমে প্রায় মাইল তিনেক দূরে শোন-প্রয়াগ। ছোট্ট জায়গা। কোন চটি নাই, একটিমাত্র দোকান। চা আর লাড্ডূ পাওয়া যায়। ত্রিযুগীনারায়ণের রাস্তা এখানে এসে নেমেছে। সামনে বাসুকী গঙ্গা, আর সামনেই কেদার থেকে মন্দাকিনী গর্জন করতে করতে এসে নেমেছেন। একটু উপর থেকে এসে বাসুকীর বুকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পাহাড়ের পথে এ পর্যন্ত অনেক প্রয়াগ দেখেছি। অলকনন্দা ও ভাগীরথীর নৃত্যচঞ্চল গর্জনশীল রূপও দেখেছি কিন্তু সঙ্গমের জায়গায় সে সকল নদী যেন সমান তালে একই স্তরে এসে মিশে গেছে। কিন্তু এই প্রয়াগের বিশেষত্ব এই যে বাসুকী কতকটা সমান স্তরে বয়ে এসেছে, আর মন্দাকিনী কতকটা উপর থেকে এসে হঠাৎ একেবারে বাসুকীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুই নদী মিশে একাকার হয়ে গেছে আর একটু নিচে। ঠিক জলপ্রপাত নয় অথচ উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্যটা এখান থেকে বেশ দেখা যায়। চা-সাহেব ও সুবোধ বাসুকীর ধারে নেমে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু অমন সুন্দর জায়গার ফোটো নেওয়া গেল না।

নদীর ধার থেকে উঠে এসে চা-টা খেয়ে ঝোলাপুলে বাসুকী পার হওয়া গেল। পার হয়েই চড়াই আরম্ভ। বস্তুত এখান থেকেই কেদারের চড়াই শুরু হল। হেঁটেই অবশ্য চলতে আরম্ভ করলাম। কাণ্ডিতে ভারি অসুবিধা।

বেশ একটু চড়াই ভাঙতে হল। নদী থেকে আধ মাইল উঠেই মুণ্ডকাটা গণেশ পাওয়া গেল। এখানে নাকি শনি ঠাকুরের দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড দেহচ্যুত হয়েছিল। মুণ্ডবিহীন মূর্তি ও গণেশের এক মন্দির এখানে আছে। এখানকার উচ্চতা ছ হাজার ফুট। মন্দাকিনী নদী ডানদিকে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বস্তুত নদীর গতিপথ অনুসারে নদীর ধারে ধারেই সাধারণত পাহাড়ের রাস্তা তৈরি হয়ে থাকে, কেন না নদী সর্বদা স্বাভাবিক গতিতেই সহজ পথ অনুসরণ করে। তাই মন্দাকিনীর ধারে ধারেই আমাদের রাস্তা। এখন মন্দাকিনীকে ডানদিকে রেখে আমরা চলেছি। কিন্তু মন্দাকিনী অনেক নিচু দিয়ে চলেছে। সব সময় তার জল দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার আওয়াজ সর্বদাই শুনতে পাচ্ছি।

গৌরীকুণ্ড

৩০ তারিখ দুপুর নাগাদ গৌরীকুণ্ডে এসে পৌঁছলাম। শোনপ্রয়াগ থেকে প্রায় তিন মাইল দূর। এখানে মন্দাকিনী আর নিচুতে নাই। আমাদের একেবারে পাশ দিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে দ্রুত গতিতে বয়ে চলেছে। স্বল্পপরিসর গিরিনদী তার জলভার বইতে পারছে না। কোন দিকে ছড়াবারও উপায় নাই। তাই ভারমুক্ত হবার জন্য প্রচণ্ড কল্লোলে দ্রুতগতিতে নিচের দিকে ছুটে চলেছে।

কালি কমলিওয়ালার ধরমশালায় দোতলায় একটা ঘর পাওয়া গেল। এখানে অনেকগুলো চটি। ডাকবাংলাও আছে। কিন্তু ধরমশালাটি একেবারে নদীর উপরে। ধরমশালার বাঁধানো প্রাঙ্গণ নদীর কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘরে বসে দিনরাত নদীর গর্জন শোনা যাচ্ছে। তাই ধরমশালাই বেছে নেওয়া গেল। বেশ বড় ধরমশালা। দোতলায় অনেকগুলো ঘর। যাত্রীতে ভরতি। নিচের এক ঘরে সাধুরা ধুনি জ্বালিয়ে বসেছে। গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা ৬,২৫০ ফুট। কেদার এখান থেকে আট মাইল। এ রাস্তায় একটা বিপদ থেকে আমরা বেঁচেছি। উলটো পরিক্রমার কথা আর আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করছে না। নিয়মমাফিক পরিক্রমা যারা করে তাদের সঙ্গে আমরা মিশে গেছি। আমাদের আর ধরবার উপায় নাই। কেদারযাত্রীদের সঙ্গেই চলেছি, আর কেদার থেকে ফিরে যারা বদরী চলেছে তাদের সঙ্গেই মুখোমুখি হচ্ছে। এ পথের অভিবাদন হচ্ছে—জয় কেদারনাথ কি জয়!

এখানে ঠাণ্ডা ও গরমজলের দুই কুণ্ড। গৌরীদেবী স্নান করে শুচি হয়েছিলেন, তাই গৌরীকুণ্ড নাম হয়েছে। নদীতে কাপড়চোপড় পরিষ্কার করে নেওয়া হল। কেউ কেউ মগে করে জল তুলে স্নানও করলেন। নদীতে নামার কোন উপায় নাই। নামলেই খরস্রোতে ভেসে যেতে হবে। অনেকেই ঠাণ্ডা ও গরম জলে দুবার স্নান করলেন। আমরা তপ্ত কুণ্ডে স্নান করে নিলাম। প্রাচীন গৌরীমন্দিরে গৌরীমূর্তি দেখা হল।

বৈকালে জায়গাটি ঘুরে দেখলাম। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক দোকানপাট আছে। অনেক লোকের বাস। শীতকালে অবশ্য কেউ থাকে না। উপরের দিকে খানিকটা ঘোরা গেল। উপর দিকে ডাকবাংলা। এখান থেকে এক মাইলের মধ্যে উচ্চতা সাত হাজার ফুট হয়ে গেছে। রাত্রিতে বেশ শীত।

চীরবাসা ভৈরব

৩১শে মে ভোরে চা-পর্ব শেষ করে বেরিয়ে পড়া গেল। গৌরীকুণ্ড থেকেই কেদারের আসল চড়াই আরম্ভ হল। গৌরীকুণ্ড ৬,২৫০ ফুট, আর কেদার ১১,৭৫০। সাত আট মাইল পথ একটানা চড়াই। মাইল চারেক দূরে কেদারের পাদদেশে রামওয়াড়া। সেখান থেকে মাইল তিন চার অবশ্য চড়াইটা খুব বেশি খাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু কঠিন চড়াইটা শুরু হল গৌরীকুণ্ড থেকেই।

জয় কেদার বলে উঠতে আরম্ভ করলাম। সামনে অরণ্য। সেই ছায়াবহুল অরণ্যের ভিতর দিয়েই আমাদের পথ। দুই ধারে বিশাল মহীরুহ। তার ভিতর দিয়ে বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। মাথার উপরে আকাশ নজরে পড়ছে না। যাত্রীর ভিড় জমে উঠেছে। রোগী চলেছে, ভোগী চলেছে। অনাথ, আতুর, খঞ্জ চলেছে তাদের ক্ষতবিক্ষত শীতার্ত পা-দুটোতে ছেঁড়া কম্বলের টুকরো জড়িয়ে। সম্বলহীন সাধু চলেছে, গৈরিক বেশ, প্রসন্ন সুন্দর মুখ। কেদারদর্শন নিকট হয়ে এসেছে। এতদিনের কষ্ট বোধ হয় সার্থক হতে চলল। তাই সকলের মুখই উৎফুল্ল।

কিছু দূর উঠেই দেখা গেল সাত হাজার ফুটের চিহ্ন লাগানো আছে। দেড় মাইল দূরেই চীরবাসা ভৈরব। পাহাড়ে যেখানে যেখানে শিবের মন্দির তার প্রায় জায়গাতেই আগে ভৈরবের আস্তানা দেখতে পাওয়া যায়। ভৈরব বোধ হয় শিবক্ষেত্রের দ্বার রক্ষা করে থাকেন। তাই শিবদর্শনের পূর্বে ভৈরবকে কিছু প্রণামী দেবার ব্যবস্থাও আছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। এখানে ভৈরবকে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দেবারও একটা রীতি চলে এসেছে।

শিবের অনুচরের কোন রকম বস্ত্রেই অনুরাগ থাকার কথা নয়। প্রয়োজন তো নাই-ই। তাঁর দেহে স্বাভাবিক অকলঙ্কতার নিরাবরণ মহিমা। তবুও ভক্তদের কিছু দিতে হয়! কিন্তু সমগ্র বস্ত্রখণ্ডের পরিবর্তে চীর দিয়েই কেন কাজ সারার রীতি তা জানি না। রঞ্জিত এবং অ-রঞ্জিত নানারকমের কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভৈরব আবৃত। এই জন্যই এঁর নাম চীরবাসা ভৈরব হয়েছে।

রামওয়াড়া

আট হাজার ফুটে জঙ্গল বা স্বর্গনিশানী চটি পার হয়ে, মাইল দুই দূরে নয় হাজার ফুটে রামওয়াড়া চটিতে এসে হাজির হলাম। সামনে পথ খাড়া চড়াই-এ উঠে গেছে। পথ দেখে বেশ ভয় হয়। যাত্রীরা সকলেই বলে কেদারের চড়াই কঠিন। এইটুকু পথ আসতেই ক্লান্তি হয়েছে। এর উপর এক সঙ্গে কেদারের চড়াই চলবে না। তাই দুপুরের মত রামওয়াড়াতেই আড্ডা নেওয়া গেল। আগে ঠিক হয়েছিল রামওয়াড়াতে রাত্রিবাস করে সকাল বেলা কেদারের চড়াই আরম্ভ করা যাবে। তাতে চড়াই-এর কষ্টটা কম হবে। চা-টা খেয়ে রান্নার জোগাড় করতে করতে সেই আলোচনাই চলতে লাগল। চটিওয়ালা তাই শুনে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল। দুটো ঠাট্টাও করে নিলে। সময় হাতে থাকতে এসে যাত্রীদের রামওয়াড়ায় রাত্রিবাস—তার অভিজ্ঞতায় বোধ হয় এ রকম কথা কোনদিন সে শোনে নাই। তাই সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে আমাদের দল তার ওখানে এক বেলা বেশি কাটালে তারই লাভ ছাড়া ক্ষতির কারণ নাই—তারই জিনিসপত্র কিছু বেশি বিক্রি হবে। সে যাই হোক খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম করা গেল। এখানে চটি অনেকগুলো আছে বটে কিন্তু জায়গার

কোন আকর্ষণ নাই। অথচ শীত বেশি। তাই যাত্রীরা অনেকেই গৌরীকুণ্ড থেকে সোজা কেদারনাথ যায় ও পূজো দিয়ে সেইদিনই গৌরীকুণ্ডে ফিরে আসে ও সেখানেই রাত্রিবাস করে। শীত সহ্য করে যারা রাত্রিবাস করতে চায়, তারা কেদারেই রাত্রিবাস করে। বাধ্য না হলে রামওয়াড়ায় বড় কেউ রাত্রিবাস করে না।

—

কেদারনাথ

বিশ্রাম সেরে মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যেই কেদারের মুখে রওনা হলাম। সামনেই রাস্তা দেখা যাচ্ছে। খাড়া উপরে উঠে গেছে। তুঙ্গনাথের চাইতে কম খাড়া কিন্তু বদরীনাথের চাইতে বেশি। সঙ্গে কাণ্ডি দুটি ছিল। আমি দুদিনে মোট মাইল তিন চার চড়েছিলাম। এখানে চড়াই দেখে প্রথমে কাণ্ডিতে উঠে বসলাম। আধ মাইল যেতে না যেতেই মনে হল লোকের পিঠে চড়ে দেবদর্শনে যাওয়ার কোন মানে হয় না। অসোয়াস্তি হতে লাগল। নেমে পড়ে পায়ে হেঁটেই চলতে লাগলাম। ঝির ঝির করে একটু আধটু ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি হয়ে গেল। তাতে বিশেষ কিছু অসুবিধে হল না।

কেদার-বদরী দুই ধামে একসঙ্গে যারা তীর্থ করতে আসে তারা সাধারণত কেদার দর্শন করে বদরী যায়। কেদার-মন্দিরের দরজাই প্রথমে খোলার একটা রীতি অনেক দিন থেকে চলে এসেছে। সাধারণত ৩০ শে এপ্রিল কেদারের দরজা খোলা হয় আর বদরী-মন্দিরের দরজা খোলা হয় ১২ই মে। বরফ কেটে তখন রাস্তা তৈরি করতে হয়। তবুও রাস্তার অনেকখানিই বরফে ঢাকা থাকে। তখন এ-রাস্তায় অনেক তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলতে হয়। এমনও হয় যে, কোন কোন

বার গৌরীকুণ্ডের পর থেকেই তুষারক্ষেত্র শুরু হয়। কিন্তু আমরা প্রথমে বদরী যাওয়ায় তুষারক্ষেত্র পেয়েছিলাম সেই রাস্তায়। এখন এখানকার রাস্তার বরফ সব গলে গিয়েছে। তাই এদিকে তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়ে আমাদের হাঁটতে হল না।

হনুমান চটি থেকে বদরীনাথ ওঠার প্রথম দিকে বেশ খানিকটা পথ গাছপালায় ঢাকা ছিল। এ-পথে গাছপালার বিশেষ বালাই নাই। নিচের দিকে গুল্মজাতীয় কিছু দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সে অনেক নিচে। কিছু দূর এগোতেই দেখি দু দিকেই পাহাড়ের মাথা থেকে মোটা মোটা জলধারা খুব বেগে এসে নিচে পড়ছে, কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে, কখনও বা অনেক উঁচু থেকে সোজা নিচে জলপ্রপাতের মত। রাস্তা পার হয়ে আমাদের ডান দিকে মন্দাকিনীতে গিয়ে পড়ছে। মন্দাকিনীতেও নিঃসন্দেহ বরফ নাই। তার তুষারস্তম্ভন কেটে গিয়েছে। সব বরফ গলে জল হয়ে গেছে। কিন্তু মন্দাকিনী অনেক নিচুতে। মন্দাকিনীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। পাহাড়ের মাথার দিকে যত দূরে দেখা যায়, জলকে থমকে থাকতে বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। যতটা দেখা যাচ্ছে ততদূরকার বরফ গলে জল হয়ে পড়ছে। এখানে এখন কেদার ধ্যানমগ্ন নন। তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়েছে।

রামওয়াড়া থেকে কেদারনাথ তিন চার মাইল। বেশির ভাগটাই চড়াই। শেষের দিকে সিকি মাইল পথ প্রায় সমতল। আস্তে আস্তে নিচে নদীর দিকে নেমে গেছে। এ পথে মন্দাকিনীর দেখা মিলল। কেদারনাথ শহর দেখা গেল। শহরের পেছন দিকের পাহাড় তখনও বরফে অনেকখানি ঢাকা। আশপাশের পাহাড়ের গায়ের বরফ তখন গলে জল হয়ে গিয়েছে। শোনা গেল, আরও উপরে চিরতুষারের দেশ। তার মধ্যে একটা হ্রদে এখনও হিমশীতল জল দেখতে পাওয়া যাবে।

কেদারে যখন পৌঁছলাম সূর্য তখন পাটে বসেছেন। তখনও

গোধূলি-আলো, অন্ধকার তখনও নামে নি। মন্দাকিনী পর্যন্ত নেমে আবার একটু উঠে সামনেই নেপালরাজের ভাল ধরমশালা। আমরা সেই নেপালী ধরমশালাতেই উঠলাম।

৩১শে মে সন্ধ্যায় নেপালী ধরমশালায় আশ্রয় নেওয়া গেল। একতলায় গালিচা-বিছানো ঘর। জানালায় কাচের শার্সি। ভাল করে বন্ধ করা যায়। ঘরে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকার উপায় নাই। ঘরে জিনিসপত্র রেখে মন্দির দেখতে বেরোলাম। ছোট শহর। পোস্ট-অফিস, বাজার পার হয়ে এক প্রান্তে কেদারনাথজীর মন্দির। মন্দিরের ঠিক পেছনেই পাহাড়ের সার। পেছনের পাহাড়ের গায়ে তুষার জমে আছে। মে মাসের শেষ, তবুও সব তুষার তখনও গলতে পারে নাই। তুষারাবৃত গিরিরাজের পটভূমিকার সামনে কারুকার্যবিহীন অনাড়ম্বর মন্দির তার অনলঙ্কৃত রুক্ষ শোভা নিয়ে বিশ্বের ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট পরিবেশের মধ্যে ছোট্ট মন্দির। উচ্চ, প্রশস্ত অলিন্দ। নিরাভরণ মন্দিরগাত্র। পরম বৈরাগী শঙ্করের যোগ্য আবাস। পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের মহিমায় মহিমান্বিত।

বিষ্ণুর চতুর্দিকে সৃষ্টির ঐশ্বর্য। বর্ণে, গন্ধে, আলোয়, শোভায় ঝলমল। ঐশ্বর্যশালী হয়েও তিনি ঐশ্বর্যের অতীত। বাইরে তিনি ঐশ্বর্যবিলাসী, অন্তরে তিনিও পরম বৈরাগী। শঙ্কর অন্য রকম। ঐশ্বর্যের খেলার ভিতর দিয়ে তাঁর বৈরাগ্য নয়। সকল ঐশ্বর্যকে উড়িয়ে পুড়িয়ে ঝরিয়ে দিয়ে, তুচ্ছ নস্যাৎ করে তাঁর বৈরাগ্য। সর্ব বাহুল্যকে অস্বীকার করে তাঁর বৈরাগ্য। সেখানে সৃষ্টির স্থান নাই, আছে প্রলয়ের, আছে সংহারের। তাই তিনি রুদ্র, তিনি মহাকাল, তিনি নটরাজ। আপন আনন্দে মগ্ন হয়ে তিনি রৌদ্রনৃত্যে মত্ত। তাই তাঁর আবাস রুক্ষ, শুষ্ক, সর্ব-আভরণ-হীন।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। আরতির সময় খোলা হবে। বাজারের

দোকানপাট দেখে ধরমশালায় ফিরে এলাম। যে রকম ঠাণ্ডা তাতে মনে হল একবার শৌচের চেষ্টা দেখে আসা ভাল। সুধীরবাবু ও আমি গেলাম। খানিকটা নেমে যেতে হল। শৌচাগারের ব্যবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। তবে বদরীনাথের মত স্থায়ী ব্যবস্থা নাই। জলের কোন বন্দোবস্ত নাই। সুধীরবাবু নীচে নেমে মন্দাকিনী থেকে জল নিয়ে এলেন। শুচি তো হলাম, কিন্তু সেই তুষারশীতল জলের স্পর্শে আমার রীতিমত কাঁপুনি ধরে গেল। কোন রকমে ধরমশালায় ফিরে এলাম। বারান্দায় যাত্রীরা আগুন করে হাত-পা গরম করছে। আগুন-তাতে একটু গরম হয়ে ঘরে গেলাম। গরম কাপড় যা কিছু ছিল পরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সবাই আরতি দেখতে গেলেন। আমার যাওয়া হল না। আমি তখন লেপের ভিতরে গরম হবার চেষ্টা করছি।

আরতি দেখে ওঁরা খাবার নিয়ে ফিরে এলেন। ডবল করে গরম চা খেয়ে শীত একটু কমে এল। লেপ গায়ে দিয়েই চিঠিপত্র লেখা হল। খেয়ে দেয়ে দোর-জানলা ভাল করে এঁটে সবাই শুয়ে পড়লাম। বই-এ পড়েছিলাম উঁচু জায়গা বলে কেদারে কারও কারও শ্বাসকষ্ট হয়। এখানকার উচ্চতা এগারো হাজার সাত-শ পঞ্চাশ ফুট। শ্বাসকষ্ট ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু ভাল ঘুম হল না। শীত ঠিক নয়, শীতের ভাব তখন অনেকটা কেটে গিয়েছে, অথচ কেমন একটা অসোয়াস্তির ভাব। সারা রাত এপাশ ওপাশ করলাম। সকালে উঠে জানা গেল কারুরই ভাল ঘুম হয় নাই। কেন, কেউ বলতে পারলেন না। একজন মাত্র শ্বাসকষ্টের কথা বললেন।

কেদারের বিগ্রহ ও পূজা

পয়লা জুন। কেদারনাথের পূজো দিতে যেতে হবে। মেয়েরা কেউ কেউ মন্দাকিনীতে স্নান করে নিলেন। আমরা অনেকেই স্নান করতে সাহস পেলাম না। জল ছিটিয়ে মাথায় দিলাম। হাত ডোবাতে জলে যেন হাত কেটে নিয়ে গেল। যতটুকুতে জল লাগল একেবারে অবশ হয়ে গেল। হাতের আঙ্গুলগুলোকে আর নিজের বলে মনে হল না। নদী থেকে ওঠার সময়ে দেখি এক হিন্দুস্থানী মহিলা বোধ হয় স্নান সেরে উঠতে গিয়ে শীতে জড়সড় হয়ে রাস্তার উপরেই বসে পড়েছেন।

মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের দরজা খোলা। যাত্রীরা ভিড় করে পূজো দিচ্ছে। এখানে শুকনো ভোগের ব্যবস্থা—শুকনো মেওয়া, ডাল, কলাই, এলাচদানা, এই রকমের সব জিনিস। আমরাও পূজো দিতে গেলাম। পাণ্ডা ধরতে হল, পূজাবিধি ও মন্ত্রপাঠের জন্য। চা-সাহেবের এখানে খুব সুবিধে। বদরীনারায়ণের পূজোর সময়ে বিদেশী বলে তাঁকে ভিতরে থাকতে দেওয়া হয় নাই। শঙ্কর শ্মশানের দেবতা। তাঁর দেশী বিদেশী, ধনী দরিদ্র, ছোট বড়র ভেদ নাই। সকলেই তাঁর কাছে সমান। চা-সাহেব সকলের সঙ্গে মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করলেন, দানধ্যান করলেন, বিগ্রহ স্পর্শ করে ঘৃতানুলেপন করলেন। ঠাকুরের দ্বারীরা যে তাঁকে ফিরিয়ে দিল না সেজন্য খুব খুশি।

শঙ্করের বিগ্রহ প্রচলিত লিঙ্গমূর্তি নয়। মনে হয় স্বাভাবিক পাহাড়ের মাথা থেকে একটা অংশ ত্রিকোণাকারে কেটে নেওয়া হয়েছে। এমনও হতে পারে, যেখানে মন্দির তৈরি হয়েছে সেইখানেই হয়তো স্বল্পবিস্তৃত একটা অনুচ্চ পাহাড়ের সার ছিল।

তার বাকি সবটাকে কেটে বার করে দিয়ে এই ত্রিকোণাকার খণ্ডটুকুকে রেখে দেওয়া হয়েছে আর তার চার পাশে মন্দির তৈরি করা হয়েছে। ত্রিকোণাকার অসমান-গাত্র প্রস্তরখণ্ডটির নিচের দিকটা চওড়া আর মাথার দিকটা অপেক্ষাকৃত সরু কিন্তু বিগ্রহের পরিধি-গাত্র মোটেই মসৃণ ও সুগোল নয়। বহু যুগ ধরে ঘৃতচর্চিত হওয়ায় বিগ্রহের অঙ্গ খানিকটা পালিশ হয়েছে বটে কিন্তু সেও নামে মাত্র।

শিবের লিঙ্গমূর্তি আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। কেউ কেউ বলেন ভারতের আদিম কালের-লোকেদের কাছ থেকে এটি পাওয়া। এক সময়ে না কি এই লিঙ্গমূর্তির সংস্কারের চেষ্টা হয়। কেউ কেউ বলেন জগদ্‌গুরু আদি শঙ্করাচার্যই এই চেষ্টা করেন। তাঁরই চেষ্টায় কেদারনাথের বিগ্রহ, কাশীর কেদারঘাটের শিববিগ্রহ, আরও দুই এক জায়গার শিব-বিগ্রহ সংস্কৃত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করে। ভগিনী নিবেদিতার ধারণা এই সংস্কার আদি শঙ্করাচার্য করেন নাই, করেছিলেন আর এক শঙ্করাচার্য। নিবেদিতার মতে তিনি বাঙালী ছিলেন।

বিগ্রহের গায়ে ঘি মাখাতে মাখাতে চা-সাহেব খুব খুশি হয়ে বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। আমরা সকলেই খুব করে ঘি মাখালাম, ধূপদীপ দেওয়া হল। মাথায় নানা রকমের জিনিস চড়ান হল। মেয়েরা কি কি সব দান টান করলেন! পূজোর শেষে শুকনো প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

শঙ্করাচার্য্যের সমাধি

মন্দির-কমিটির আফিসে আফিসের কর্মচারী-ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ সালাপ করা গেল। সজ্জন লোক। বললেন, এখানে আদি শঙ্করাচার্যের সমাধি আছে মন্দাকিনীর তীরে। একটি লোক দিলেন সঙ্গে জায়গাটি দেখিয়ে দেবার জন্য। নদীর তীরে একটি তৃণশষ্পাচ্ছাদিত নিচু জায়গা সে দেখিয়ে দিলে। কোন রকমের কোন স্মারক চিহ্ন সেখানে নাই কেন জিজ্ঞাসা করায়, লোকটি বললে বর্ষায় সে জায়গা জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে যায়। ভারতবর্ষের অমন এক মহা মনীষার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত তাঁর সমাধিস্থানে হয় নাই, এর চাইতে লজ্জার বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। মন্দির-কমিটিই বা কেন এ কাজ করেন না তা জানি না।

কেদারনাথে সরস্বতী নামে আর একটি জলধারা এসে মন্দাকিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দুটি নদীই শীর্ণকায়া। মন্দাকিনী ·অগভীরও বটে কিন্তু খরস্রোতা। সরস্বতীর শীর্ণ, অগভীর জলরাশি মৃদুগতিতে এসে মন্দাকিনীতে পড়েছে। জলও কম, স্রোতও ক্ষীণ। এটা অবশ্য গ্রীষ্মকালের কথা। বর্ষার প্লাবনে হয় তো দুটি নদীই একাকার হয়ে যায়। পাথর টপকে টপকে আমরা সরস্বতী পার হয়ে গেলাম। একটা কোণ দিয়ে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে মনে করে এগিয়ে গেলাম। একটু ওঠাও হল, কিন্তু দেখা গেল, মাটি ধুয়ে গিয়ে পাথরগুলো আলগা হয়ে গেছে। বোধ হয় বরফ গলে জল হয়ে পড়ার সময় পাথরগুলোকে আলগা করে দিয়েছে। না বুঝে যেখানে সেখানে পা দিলে পাথরসমেত হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। লোকেরাও

বললে, বিপজ্জনক পথ, ভাল পথপ্রদর্শক না নিয়ে ওখান দিয়ে পাহাড়ে ওঠা কঠিন। অগত্যা ফিরে এলাম।

এতক্ষণে জানা গেল কেদারনাথের এক ভৈরব আছেন। সামনেই ছোট একটা টিলার উপরে তিনি থাকেন। তাঁকে না দেখে যাওয়া চলে না। অনেকেই ভৈরব দর্শন করে এলেন। আমরা দুই এক জন আর গেলাম না। তাঁদের জন্য নিচেই অপেক্ষা করে রইলাম। তাঁরা নিচে নামলে সবাই একসঙ্গে ধরমশালায় ফিরে এলাম। দোকান থেকে পুরী টুরী আনিয়ে খেয়ে নেওয়া গেল। মোটঘাট বেঁধে দুপুরের আগেই ফিরতি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

ত্রিযুগীনারায়ণ

হুড়হুড় করে নেমে এলাম। যতটা হুড়হুড় করা যাবে মনে করেছিলাম ততটা ঠিক হল না। প্রথম দিকে একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি পেলাম। তাতে আর কিছু হল না তবে রাস্তা খানিকটা পেছল হয়ে গেল। সেটুকু সাবধানে লাঠি ভর দিয়ে নামতে হল। সে অল্প কিছু জায়গা। খুব অল্প সময়েই রামওয়াড়া পৌঁছে গেলাম।

রামওয়াড়া, জঙ্গল বা স্বর্গনিশানী চটি, বনান্তরালে চীরবাসা ভৈরব, সব পার হয়ে চললাম। নামবার মুখে থামার আর কোন কথা নাই। থামবার মত জায়গাও নয় এগুলি। বৈকাল নাগাদ একেবারে গৌরীকুণ্ডে এসে হাজির। কালি কমলিওয়ালার ধরমশালায় দোতলার সেই ঘরটিতেই জায়গা পাওয়া গেল। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ২রা জুন তারিখ সকালে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

মুণ্ডকাটা গণেশ, শোনপ্রয়াগে বাসুকী-মন্দাকিনীর সঙ্গম পার হয়ে ত্রিযুগীনারায়ণের রাস্তা ধরা গেল। শোনপ্রয়াগের আগে রামপুর। একটু বড় জায়গা। অনেকগুলো চটি। ধরমশালাও আছে। আসার সময় রামপুর পার হয়েই ত্রিযুগীনারায়ণের এক রাস্তা পেয়েছিলাম। যাঁরা কেদারে যাবার আগে ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে যান তাঁরা রামপুর পার হয়েই কেদারের রাস্তা থেকে ভেঙে ত্রিযুগীনারায়ণে উঠতে আরম্ভ করেন। ফেরার পথে আমরা শোনপ্রয়াগ পার হয়ে মূল রাস্তা থেকে ভেঙে ত্রিযুগীনারায়ণ উঠতে আরম্ভ করলাম। রাস্তা উপর দিকে উঠে গেছে। ভালই রাস্তা, ডাইনে-বাঁয়ে কোন খাদ নাই। মাইল দেড়েক গিয়ে শাকম্বরী দেবীর মন্দির। এ পর্যন্ত গাছপালা বিশেষ নাই। শাকম্বরী দেবীর মন্দির পার হয়ে আরও মাইল দুই গেলে ত্রিযুগীনারায়ণে পৌঁছোনো যায়। এই রাস্তা বেশ সমতল। দুধারে গাছপালা। মাঝে মাঝে ছায়া পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তার দুধারে দুটো একটা গ্রাম পাওয়া গেল। গাছপালায় ঢাকা বাঙলাদেশেরই ছায়াশীতল গ্রামের মত। এ রাস্তাটা বেড়াতে বেড়াতে বেশ যাওয়া গেল। শেষ আধ মাইলটেক রাস্তায় আবার একটু উঠে ত্রিযুগীনারায়ণ পাওয়া গেল। পাহাড়ের গায়েই ত্রিযুগীনারায়ণ। ত্রিযুগীনারায়ণ থেকে পাহাড় ধীরে ধীরে আবার উপরে উঠে গেছে। পাহাড়ের মাথায় ঘন বন। সারের পর সার গাছের মাথা উপরপানে উঠে গেছে।

রোদের তেজ হয়েছে। এক চটিতে আস্তানা নেওয়া গেল। বিছানা আর খোলা হল না। পাটির উপরে একটু জিরিয়ে নিয়ে মন্দির দেখতে গেলাম। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। জলের কয়েকটি কুণ্ড আছে। একটি যজ্ঞক্ষেত্র। যজ্ঞক্ষেত্রে ধুনি জ্বলছে। সত্যযুগে এখানে শঙ্করের সঙ্গে সতীর বিয়ে হয়েছিল। সতীর বিবাহেরই এই যজ্ঞকুণ্ড। তিন যুগ ধরে অনির্বাণ জ্বলছে। মেয়েরা এই

ধুনিতে কাঠ দিচ্ছে। যাত্রী যারা আসে তারা সবাই আগুনে কাঠ তো দিয়েই যায়, তা ছাড়া ভবিষ্যতে কাঠ দেওয়ারও ব্যবস্থা করে যায়। কাঠের অভাব এখানে নাই। দরকারমত স্থানীয় লোকেরাও আগুনে কাঠ দিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে রাখে।

এখানে কারুরই স্নান হল না। কোনরকমে মাথাটাথা ধুয়ে নেওয়া হল। দোকান থেকে পুরী ভাজিয়ে এনে খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। বৈকাল না হতেই বেরিয়ে পড়লাম। বেরোবার মুখে গাঁয়ের উপরে উঠে বনের মধ্যে গঙ্গোত্রী যাবার রাস্তাটাও দেখে নিলাম। যাঁরা চার ধাম করেন তাঁরা এই পথে গঙ্গোত্রী থেকে এখানে আসেন। মাইল চারেক গিয়ে কেদার-রুদ্রপ্রয়াগের মূল রাস্তায় পড়া গেল। সামনেই রামপুর। একটা দোতলা চটিতে রাতটা কাটানো গেল।

ব্যুঙ্গ

৩রা জুন সকালে রামপুর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দেড় মাইল বদলপুর। এক মাইল বড়াসু। যাবার সময় নিরিবিলি বড়াসুতে এক রাত্রি ছিলাম। আড়াই মাইল ফাটা। বড় জায়গা। অনেকগুলি চটি, ডাকবাংলা। কতকগুলি পানচাক্কি আছে। এখানে আমাদের থাকা হয় নাই। মাইল দেড়েক মৈখণ্ডা বা দোলা। এবার আর মৈখণ্ডায় না থেকে মাইল দুই এগিয়ে ব্যুঙ্গে গিয়ে আড্ডা জমানো গেল।

অনেক নিচে নেমে এসেছি। এখানকার উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের কাছাকছি। ৩ তারিখের দিনরাত এখানেই কাটিয়ে দিলাম। গুপ্তকাশীতে একদিন থাকতে হবে। গুপ্তকাশী কাছেই। কাজেই এখান থেকে পরদিন রওনা হওয়াই ঠিক হল। একটা চটিতে

একটা এঁচড় দেখে খুব লোভ হল। একটু ঘোরাফেরা করলাম বিক্রি করে কি না জানবার জন্য। জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। খানিকটা বাদে দেখি চটিওয়ালা নিজেই এসেছে মাইজীদের কাছে জেনে নিতে যে ঐ নূতন তরকারিটা কি করে কুটতে হয় ও কেমন করে রান্না করতে হয়। নিচের কোন জায়গা থেকে নিজের খাবার জন্য ওটি সে সংগ্রহ করে এনেছে।

পরের দিন ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। মাইল দুই ভেতা। তার পর এক মাইল নালা। সুধীরবাবুরা রাস্তা থেকে ভেঙে পাঁচ মাইল দূরে কালীমঠ দেখতে গেলেন। আমরা এগিয়ে চললাম। একান্ন পীঠের এক পীঠ কালীমঠ। নালার আগেই সুধীরবাবুরা ফিরে এলেন। বললেন, মন্দাকিনী পার হয়ে সরস্বতী বা কালীগঙ্গার ধারে কালীমঠ, খুব নির্জন ও সুন্দর জায়গা, সাধন ভজনের উপযুক্ত স্থান। আসল পীঠস্থানটি নিকটেই নদীগর্ভে চলে গেছে। এটি তার পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নালাতে সকলে একসঙ্গে হয়ে চা, প্যাঁড়া ইত্যাদি দিয়ে জলযোগ করে গুপ্তকাশীর দিকে এগিয়ে চললাম। বদরীনারায়ণ থেকে এসে এই নালাতেই আমরা কেদারের রাস্তা ধরেছিলাম। মাইল দেড়েক হবে গুপ্তকাশী। রোদের তেজ হয়েছে কিন্তু রাস্তাটুকু বেশ সুন্দর লাগছে। দুই ধারে পাহাড়ের গায়ে আঁকা-বাঁকা পথে রূপোলি স্রোত নিয়ে মন্দাকিনী বয়ে চলেছে। ওপারে উখিমঠের মন্দির ও গ্রাম, এপারে গুপ্তকাশী। পেছনে মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে তুষারাবৃত গিরিশীর্ষ দেখে নিচ্ছি।

গুপ্তকাশী

দুপুরের আগেই গুপ্তকাশী পৌঁছে গেলাম। বেশ বড় জায়গা। অনেক লোকের বসতি। দোকানপাট ব্যবসাপাতি বেশ। ভাল ভাল বাড়ি। অনেকগুলো চটি, ধরমশালা, ডাকঘর সবই আছে। গোপেশ্বর-চটির মাদ্রাজী ভদ্রলোক গুপ্তকাশীর মন্দির-কমিটির কাছে এক চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠির জোরে মন্দিরকমিটির বাঙলোয় আমাদের জায়গা হল। খুব ভাল বন্দোবস্ত। পাকা বাড়ি, টালির ছাদ। দুধারে দুটো ঘর। মাঝখানে একটা হল-ঘর। সামনে বারান্দা। পাশের দুটো ঘরের সংলগ্ন দুটো কমোডের ব্যবস্থা। নেয়ারের খাট, চেয়ার, টেবিল, ইজি-চেয়ার, সব রকম বন্দোবস্তই আছে। সামনে দুটো চারটে ফুলের গাছ। বেশ আরামে হাত পা ছড়িয়ে বসা গেল। এ রকম আমিরি বন্দোবস্ত এ যাত্রায় পাহাড়ে আর কোথাও পাই নি।

স্নান করে বিশ্বেশ্বর দর্শন করা হল। এরা বলে মোগল আমলে কাশীতে অত্যাচারের সময়ে বিশ্বেশ্বরকে লুকিয়ে না কি এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। মন্দির দর্শন করে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে নেয়ারের খাটে তোফা ঘুম দেওয়া গেল। বিকেলেই বেরিয়ে পড়ার কথা, কিন্তু অনেক দিন এ রকম আরামের ব্যবস্থা পাওয়া যায় নাই। তাই রাতটা কাটিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হল।

গুপ্তকাশীতে নিচের দিকে নেমে নদীর ধারে সবজি চাষের ব্যবস্থা হয়েছে। সবজি কেবল দেওয়া হয়েছে। শাকপাতা অল্পস্বল্প বেরিয়েছে, এখনও তেমন বড় হয় নাই। চা-সাহেবের খুব স্ফূর্তি। বললেন, আজ তিনি রান্না করবেন। বলে, সেই সবজি-খেতে নিচের দিকে নেমে গেলেন। অনেক স্যালাডপাতা ও

গাছসুদ্ধ কচি পেঁয়াজ সংগ্রহ করে তিনি ফিরে এলেন। মন্দির-কমিটির সম্পাদককে বলে পাঠানো হল যে রাত্রে থাকা হবে। চা-সাহেব পরমোৎসাহে রান্না করতে লেগে গেলেন। আমাদের খুব আনন্দ। রাত্রে খাবার টেবিলে বসে দেখি, সে এক কাণ্ড! স্যালাড শাক আর আলু-পেঁয়াজ ভাজা হয়েছে। উৎসাহের সঙ্গে খেতে গিয়ে দেখি দুটোই আধ-সেদ্ধ। চা-সাহেব অত কষ্ট করে রেঁধেছেন! তারিফ করেই খেতে হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার পাতে অনেক পড়ে রইল। অতি কষ্টে অল্প যা হোক কিছু খাওয়া গেল।

অগস্ত্যমুনি

৫ তারিখ ভোরে উঠে দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটু দেরি করে তারই মধ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। নেমে চললাম। দু মাইল দূরে কুণ্ড। কুণ্ডে পৌঁছতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমে গেল। তারই মধ্যে ছাতা খুলে চলতে লাগলাম। অল্প দূর যেতে না যেতেই বৃষ্টির জোর হল। তখন বাধ্য হয়ে রাস্তার মাঝে একটা ছোট জায়গায় থামতে হল। কৌনিয়াদানা বা নারায়ণ চটি। একটিই মাত্র চটি। কিছু পরে বিছানা টিছানা ভিজিয়ে নিয়ে মুটেরা এসে হাজির। দুপুরে ওখানেই খিচুড়ি খাওয়া গেল। বৃষ্টি ছাড়লে বৈকালের দিকে বেরিয়ে পড়া হল। কুণ্ড থেকে মাইল চারেক ভিরি। ভিরি ছাড়িয়ে চললাম। পথ সমতল হয়ে গেছে। পাশেই মন্দাকিনী বয়ে চলেছে। স্রোতে বেগ নাই। বৈকালে ছায়ায় ছায়ায় পথ চলতে বেশ আরাম লাগছে। ভিরি থেকে তিন সাড়ে-তিন মাইল চন্দ্রপুরী। সন্ধ্যার মুখে চন্দ্রপুরী পৌঁছে গেলাম। এখানে মন্দাকিনীর সঙ্গে চন্দ্রা নদীর সঙ্গম হয়েছে।

চন্দ্রপুরী নিরিবিলি সুন্দর জায়গা। চটিগুলি ভাল। এখানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালেই আবার পথচলা শুরু হল। আড়াই মাইল দূরে সৌরী পার হয়ে আরও আড়াই মাইল গিয়ে অগস্ত্যমুনি পাওয়া গেল। এখানে অগস্ত্যমুনির মন্দির। প্রায় সমতল জায়গা। প্রশস্ত বড় মাঠ। শুনলাম এই মাঠে উড়ো জাহাজ নামার কথা হয়েছিল। এখানে ধর্মশালা, সদাব্রত, ডাকঘর ও কয়েকটি চটি আছে। ত্বপুরবেলাটা ধরমশালায় কাটিয়ে বেলা থাকতেই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার ত্বধারে ছোট ছোট আমগাছ। তলায় কচি আম পড়ে রয়েছে। আমরা আম কুড়োতে কুড়োতে চললাম। অম্বল খেতে হবে। সুতরাগড়, রামপুর, মঠ পার হয়ে সন্ধ্যার মুখে মাইল আষ্টেক দূরে ছতোলিতে পৌঁছলাম। রাত্রিবাসটা সেখানেই এক চটিতে হল।

ফিরতি

৭ তারিখ সকালেই রওনা। রাস্তায় নদী পার হয়ে বুদ্ধিরামের বাড়ি। সেখানে একবার যাবার কথা হল। কিন্তু ফেরার ঝোঁকটা বেশি। তাই সেখানে যাওয়া হল না। ছতোলি থেকে পাঁচ মাইল গিয়ে সকাল সকালই রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের ধরমশালায় দোতলায় সেই ঘরটিতে গিয়ে উঠলাম।

মনে করা গিয়েছিল বাস্ পেতে দেরি হবে। কাজেই বাধ্য হয়ে রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে ত্বই এক দিন থাকতে হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বৈকালেই শ্রীনগরের বাস্ পাওয়া যাবে। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে বাস্-স্ট্যাণ্ডে গেলাম। বৈকালেই বাস্ পাওয়া গেল। কুলিরা মালপত্র বাস্-এর মাথায় তুলে দিলে। এবারে বিদায়ের পালা। এত দিন ধরে কুলিদের সঙ্গে একসঙ্গে

কাটিয়েছি। ওরা মোট বয়েছে বটে কিন্তু ওরাই ছিল আমাদের সঙ্গী। দিনরাত আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছে। কি পরিশ্রম করে আর কত কম মজুরি পায়! এত গরিব অথচ এমন বিশ্বাসী। এদের কাছে নিজেদের অপরাধী বলে মনে হয়। হিসেব করে দেখা গেল বেশি কিছু ওরা দেশে নিয়ে যেতে পারে না।

ওদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হল। মন খুলে বকশিশও দেওয়া হল। অল্পবয়সের একজন ছিল, তার চোখ ছলছল করে এল। কতই যেন আপন জন! বুদ্ধিরামের কাছেও আমরা কতই না সাহায্য পেলাম। তাকেও বেশ করে বকশিশ দেওয়া হল। মেয়েরা তার স্ত্রীর জন্য একটা ভাল শাড়ি কিনে দিলেন। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কেদার-বদরীকে নমস্কার করে আমরা রওনা হলাম। সন্ধ্যার মুখেই শ্রীনগর এসে পড়লাম। একটা হোটেলে আস্তানা নিয়ে বাস্-এর টিকিটের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালের একটা বাস্-এ সিট রিজার্ভ করে হোটেলে ফিরে এলাম।

শ্রীনগর থেকে ফেরবার দুটি রাস্তা। কীর্তিনগর, দেবপ্রয়াগ, হৃষীকেশ হয়ে হরিদ্বার। আর আমাথা, পাওরি, সাতপৌলি, দুগাড্ডা হয়ে কোটদ্বার। কোটদ্বার ও হরিদ্বার দুটোই রেলস্টেশন। আমাথা, পাওরি, সাতপৌলি ও দুগাড্ডা, এগুলি হল গেট-পোস্ট অর্থাৎ এখানে এক দিকের গাড়ি এসে আটক থাকে। আর এক দিকের গাড়ি না এলে আগেকার গাড়িগুলি ছাড়া হয় না। কেন না পাহাড়ের রাস্তা দুদিকের গাড়ি একসঙ্গে চলবার মত চওড়া নয়। পাওরি হল আবার গাড়ওয়াল জেলার সদর। এখানে জেলার কর্তার সদর-আফিস। আমরা কীর্তিনগরের রাস্তায় এখানে এসেছিলাম। এবার ঠিক হল কোটদ্বার হয়ে ফিরবো। তার একটা কারণ হল এই যে পূর্ব-নির্দেশমত চা-সাহেবকে পাওরিতে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

শ্রীনগর থেকে কোটদ্বার ৮৬ মাইল। ৮ তারিখ সকাল ৬টায়

আমাদের বাস্ ছাড়ল। শ্রীনগর নিচু জায়গা, বোধ হয় দেড় হাজার ফুট উঁচু হবে। এখান থেকে আমাদের ক্রমে উপরে উঠতে হল। পাওরি পাঁচ হাজার ফুট। পাওরিতে চা-সাহেব নেমে রইলেন। ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে, সম্ভব হলে আজ, নইলে কাল, ফের বাস্ ধরে কোটদ্বার যাবেন। পাওরিতে অনেক-ক্ষণ গাড়ি থামবে। আমরা সকলেই নেমে পড়লাম। পাওরি শহরটা বেশ সুন্দর। কাছাকাছি চার দিকের পাহাড়ের সারগুলি পাওরির চাইতে নিচু। চার দিকে সারের পর সার পাহাড় সাজানো রয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে বেশ লাগে। আমরা খানিকটা বেড়ালাম। পাহাড়ের নানা রকমের ফল এই সময়ে উঠেছে। আমরা কিছু কিছু কিনলাম। ফল ও চা-জলখাবার খেয়ে নিলাম। আজ আর কোথাও কিছু জুটবে কি না বলা যায় না।

চা-সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা চলতে আরম্ভ করলাম। রাস্তায় আমাদের সাত হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে হল। তার পরে একেবারে হুড়হুড় করে নামা। যাত্রীদের মধ্যে বমি শুরু হয়ে গেল। পারুল, দুর্গা, সুধীরবাবু সবাই কাত। আমরা কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গেলাম। সাত-পৌলিতে সবাই কিছু কিছু মুখে দিয়ে নিলেন। আমি আর ভরসা করে কিছু খেলাম না। বৈকাল তিনটে নাগাদ কোটদ্বার পৌঁছে গেলাম। শেষ বারো চৌদ্দ মাইল খুব ভাল রাস্তা। ছোট স্টেশন। গরমও পড়েছে খুব। জলের একান্ত অভাব। কোন রকমে একটু জল জোগাড় করে মুখ-হাত ধুয়ে কিছু ফল খেয়ে নিলাম। বৈকালে ছোট গাড়িতে করে কাছাকাছি নাজিবাবাদ জংশনে গেলাম। এখানে ছোট লাইন, গাড়িও ছোট। নাজিবাবাদে জানা গেল, পর দিন সকালে আমাদের ট্রেন। নাজিবাবাদ শহর বেড়িয়ে এলাম। রেলের হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে ওয়েটিং রুমেই থাকা গেল। রাত এগারোটায় দেখি হুড়মুড় করে চা-সাহেব এসে ঘরে ঢুকচেন। কি

ব্যাপার ? চা-সাহেব বললেন, ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে পরের বাস্-এই তিনি কোটদ্বারে চলে আসেন। তার পর এই ট্রেন। রাতটা তাঁর সঙ্গে হৈ হৈ করে কাটানো গেল। ভোরের দিকে তিনি নৈনিতাল চলে গেলেন। তার কিছু পরে আমরাও দেরাদুন রওনা হলাম।

দেরাদুনে ডাঃ সোমের বাড়িতে ওঠা গেল ৯ জুন তারিখে। সেখান থেকে দলবলসমেত মুসৌরি। সুবোধরা দুই এক দিনের মধ্যেই দেরাদুন ফিরে কলকাতা চলে গেলেন। সুধীরবাবু আর আমি কয়েকদিন সুশীলা ও অনাথবাবুর সঙ্গে মুসৌরিতেই কাটালাম। তারপর দেরাদুন ফিরে ডাঃ সোমের বাড়িতে কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটানো গেল। তাঁর ছেলে দুটি—বড়টি সলিলের জন্মতিথিতে প্রেমলতা রাস্তায় আমাদের ভূরিভোজ দিয়েছিল—আমাদের উৎসাহ করে দেরাদুন শহরের নানান জায়গা মায় ডাকাতদের আড্ডা, robbers' cave, পর্যন্ত দেখিয়ে নিয়ে এল। বেশ ছেলেদুটি।

দেরাদুন থেকে অনাথবাবুরা দিল্লি চলে গেলেন। সোমেদের কাছে বিদায় নিয়ে সুধীরবাবু ও আমিও কলকাতা ফিরলাম। ৬ই মে আমরা হরিদ্বার থেকে যাত্রা শুরু করি আর ৯ই জুন তারিখে দেরাদুনে সেই যাত্রা শেষ। কেদার-দর্শন প্রথমে প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল না, কিন্তু কেদার আমাদের টেনেছিলেন তাই সে কাজটাও এই সঙ্গে হয়ে গেল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। আর পাহাড়ে যাওয়া হবে না। সঙ্গী পারুল আর বুদ্ধিরাম এরই মধ্যে চলে গেছে। চা-সাহেব দেশে। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে এবার আমারই পালা।

এইখানেই তীর্থপরিক্রমার সীমারেখা টেনে দিই।

কিন্তু, সীমা ? তীর্থ-পরিক্রমার কি কোন সীমা আছে ? কোথাও কি আছে তার শেষ ? মানুষ অনন্তপথযাত্রী। যাত্রা তার

অন্তহীন। সে যাত্রার সীমারেখা টানা চলে না। হিমালয় নিয়ে চলে হিমালয়োত্তর দুরধিগম্যতায়, সমুদ্র নিয়ে চলে মহাসমুদ্রের বিশালতায়। এইরূপে তীর্থ-পরিক্রমা চলতে থাকে দূর থেকে দূরে, দূরান্তরে, আরও দূরে, ধ্যানের সেই সুদূরতম লোকে, যে লোকের কথা অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মনসোগোচর।

তাই পরিক্রমার সীমা-নির্দেশ নয়, তীর্থদেবতাকে নমস্কার করেই এই লেখার শেষ।

আবার বলি, দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের জয়, জয় বদরী-বিশালের, জয় কেদারনাথজীর। জয়, জয়, জয়···

॥ ওরিয়েণ্টের কয়েকটি বাছাই বই ॥

॥ ভ্রমণ-সাহিত্য ॥

হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর	—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬·০০
প্রমোদকুমারের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড	—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬·০০
দুনিয়া দেখছি	—কল্যাণী প্রামাণিক	৫·০০
ভারত-ভ্রমণ	—রামনাথ বিশ্বাস	৫·০০
দেশে দেশে মোর ঘর আছে	—স্বপনবুড়ো	২·৫০
মন্দিরে মন্দিরে	—ধীরেন্দ্রলাল ধর	২·০০
মহাচীনে শ্রীনেহেরু	—বার্তাবহ	৩·৫০
নতুন জাপান	—কালীপদ বিশ্বাস	৮·০০
সাতসমুদ্দুর তেরনদী পারে	—স্বপনবুড়ো	২·৫০

॥ রবীন্দ্র-সাহিত্য ॥

রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা	—ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১২·০০
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা	—ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১০·০০
রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড	—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী	৫·০০
রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড	—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী	৫·০০
রবীন্দ্র-বিচিত্রা	—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী	৫·০০
রবীন্দ্র-হৃদয়	—রেণু মিত্র	৫·০০
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ	—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৩·২৫

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥ কলিকাতা ১২ ॥